দেহলি

শ্রীহেমলতা দেবী

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০নং কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০নং কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

দেহলি

প্রথম সংস্করণ ... আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল।

মূল্য—১৷০

শান্তিনিকেতন প্রেস হইতে
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

দিনু নলিনী

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN. BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তোমার ছোট গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কী মানবচরিত্রে কী তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলা দেশের ছোট বড় নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষ্যে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্রপ্রদর্শনী। তোমার যে গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি ৮ চৈত্র ১৩৪৬

আশীর্বাদক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

দেহলি

চলাচল

এক

গ্রামের মেঠো পথটির পুবদিকের মোড়ের মাথায় একখানি মুড়ি-মুড়কির দোকান। সকাল থেকে দোকানে খরিদ্দারের ভিড় খুব বেশি—মানুষগুলি সার ক'রে দোকানখানা ঘিরে দাঁড়ায়—কিসের দোকান, কে বেচে, কী বেচে দূর থেকে চোখে পড়ে না কারো। পাশাপাশি লম্বা দুটো বাঁশ পুঁতে উঁচুতে একটা সাইনবোর্ড টাঙানো—তাতে লেখা "গ্রাম্য-জলপানের দোকান।" এতেই লোকে বোঝে যে দোকানটিতে গ্রাম্য ধাঁচের জলখাবার পাওয়া যায় কিনতে। ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলে দেখা যায় চিঁড়ে, মুড়কি, খই, ছোলা ভাজা, বাতাসা, বেগুনি, ফুলুরি, মুড়ির চাকতি, ছোলার চাকতি, খৈয়ের নাড়ু, নারকেলের ছাপা, চিনি দিয়ে পাককরা চীনের বাদাম প্রভৃতি সস্তা দরের রকমারি জলপান, সার ক'রে সাজানো কেনেস্তারাগুলিতে রাখা। নমুনাস্বরূপ মাটির ছোটো কয়েকটা গামলায় অল্প ক'রে জিনিসগুলি রাখা আছে সামনে—খরিদ্দারের চোখে পড়ার জন্য। পাতলা একখানি পরিষ্কার পুরোনো কাপড় দিয়ে গামলার মাথাগুলি ঢাকা, যেন মাছি না বসে। দোকানের ব্যবস্থা দেখলে মনে হয় নেহাত পাড়াগেঁয়ে ব্যাপার নয়। শহরের কোনো সমজদার লোক এসে যেন গাঁয়ের মাঝে দোকান খুলেছে গ্রামবাসীদের পরিপাটি ক'রে পরিচ্ছন্ন খাবার খেতে শেখাতে।

আজকাল দোকানে দুপুরে ভীড় হয় আরো বেশি। জমিদারবাবুর বিয়ে,—প্রাসাদতুল্য বাড়িখানা তাঁর আগাগোড়া মেরামত হচ্ছে, মিস্ত্রী মজুর খাটছে অসংখ্য। মেঠোপথে খোয়া ফেলে পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে যেন মোটর যাতায়াত করতে পারে। তাতেও কুলি খাটছে কম নয়। তারা সবাই দুপুরে ছুটি পেলে জলখাবার কেনে এই দোকানে।

দোকানখানা কার কেউ জানে না। দোকানদারকে কেউ কখনো দেখে নি। একটি আট বছরের ফুটফুটে স্থন্দর মেয়ে দোকানের মাঝখানে একটি চ্যাপটা টুলে ব'সে সকাল থেকে জলপান বেচে। ঐটুকু মেয়ে জিনিস দিয়ে পয়সা গুণে নেয় ঠিক। হিসাবে ভুল হয় না কোনোদিন। জিনিস নিয়ে পয়সা দিয়ে সবাই তারিফ ক'রে ফিরে যায়, বলে—মেয়েটি চালাক বটে—চাষার ঘরে এমন মেয়ে তো দেখা যায় না। সকলেই ধরে নেয়, নিশ্চয়ই মেয়েটি গ্রামবাসী কোনো চাষার হবে। দূরের লোকের এই কথা, গাঁয়ের লোকে জানে কিন্তু এরা কোনো অজানা শহরের মানুষ, বছর দু'তিন হোলো এ গ্রামে এসেছে। কোন্ জাত, কোথায় বাড়ি, কেমন স্বভাবের লোক, কে এদের আছে—কেউ তা জানে না। বাড়িতে একটা বুড়ো ঝি আছে সেই-ই পাড়ার এদিক ওদিক যায়, হাটবাজার করে, তাকেই লোকে চেনে। পাড়ার সবাই তাকে 'পয়ামাসি' ব'লে ডাকে—নাম তার প্রয়াগ—সে বেশ মিশুক সকলেরই সঙ্গে হেসে কথা কয়, আলাপ করে, তাতে খদ্দের জোটে বেশি। লোকে বলে, পয়ামাসির পয়েই দোকানের এত কাটতি। পয়ামাসি বলায় সে খুশি হয় খুব, তাই এই নামটাই তার গাঁয়ে চল্ হয়ে গেছে।

খুকির নাম শিবরানী, বুড়ো ঝি তাকে রানী ব'লে ডাকে, খুকি তাকে ডাকে ঝি-মা ব'লে। শিবরানীর মা থাকেন বাড়ির ভিতরে, তাঁকে কিন্তু কেউ কখনো দেখেনি। সকাল থেকে বেলা দশটা নাগাদ খুকি জলপান বেচে তারপরে সে নেয়ে খেয়ে পাড়ার পাঠশালায় পড়তে যায়।

কাছেই বৃদ্ধ পণ্ডিত রামতারণ ভট্চার্যির পাঠশালা। তাতেই দুপুর-বেলা পাড়ার যত ছেলে জড়ো হয়। ভট্চার্যি মশাই একাই সব ছেলে ঠেকান। দু'চারটি মেয়েও এসে জোটে, সেই সঙ্গে শিবরানীও আসে।

দুপুরে দোকানের যত ঝুঁকি সামলায় পয়ামাসি। তার বেচার ঘটা দেখে অবাক হোতে হয়। যেন দশভুজা হয়ে দশদিকে সে খদ্দেরের খবর-দারি করতে থাকে—আচ্ছা হুঁসিয়ার বুড়ি যা হোক। খুশি হয় কিন্তু সবাই তার ব্যবহারে। হাত দুই লম্বা প্রকাণ্ড এক বড়ো বাঁটের হাতায় জলপান তুলে ঢেলে দেয় সে খদ্দেরের কাপড়ে—চুপড়িতে। প্রত্যেক বারেই না চাইতে দুটি বেশি দিয়ে দেয়, তাতেই লোকের মন কেড়ে নেয় এতখানি—বাহাদুরি আছে। দোকানের নাম জেনেছে সবাই, চিনিয়ে দিতে হয় না কাউকে। কাজের চাপ দেখে সম্প্রতি একটা ছোকরা চাকর রাখা হয়েছে পয়ামাসির হাতের তলায় থেকে ফরমাশ খাটবে ব'লে।

দুই

জমিদার রূপেন্দ্রনারায়ণ রায় নব্য যুবা, বয়স ২৩ বছর, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। নাবালক থাকতেই বাপ স্বর্গগত, নিজেই এখন জমিদারির মালিক, বছর দুই হোলো সাবালক হয়ে জমিদারি হাতে পেয়েছেন; খরুচে হাত, শখও অনেক রকম। মায়ের অভিভাবকত্বে ও দেওয়ানজির তত্ত্বাবধানে রূপেন্দ্র-নারায়ণ মানুষ হয়েছেন। তাঁদের তাঁবে থাকায় তখন টাকা জমে গেছে অনেকটা। এখন খরচের পালা পড়েছে, মা, দেওয়ানজি ঠেকাতে পারেন না সহজে। সামনে কিছুটা খাতির রেখে চললেও কলকাতায় গিয়ে বাবু খরচ ক'রে আসেন খুব। বিবাহ দেওয়ার জন্য মা খুব ব্যস্ত, দেওয়ানজি ততোধিক। ব্যয়ের ঘরের অঙ্কটা প্রতি মাসে তাঁরই চোখে পড়ে স্পষ্ট ক'রে, গিন্নিমা ভয় পাবেন ভেবে কথাটা তাঁর কানে তোলেন না। কখনো কখনো আভাসে ইঙ্গিতে একটু জানিয়ে দেন মাত্র; বলেন, মা রাজা বাবুর বিয়ে দিয়ে বৌরানী ঘরে আনুন, মা-লক্ষ্মী বাঁধা থাকবেন।

কর্মচারী চাকর বাকর সবাই ছোটো থেকে রূপেন্দ্রনারায়ণকে রাজা-বাবু ব'লে ডাকে। দেওয়ানের কথা শুনে মা উতলা হয়ে উঠেন আরো বেশি। ছেলের শখ গ্র্যাজুয়েট মেয়ে বিয়ে করবেন হাল ফ্যাশানের। সেকেলে মেয়ে সেকেলে বৌ তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। হাজার মেয়ে দেখা হচ্ছে; বন্ধুদল নিয়ে তিনি নিজেই মেয়ে দেখে আসেন, মনে ধরে না কাউকে। কলকাতার ডাক্তার নরেশচন্দ্র বসুর মেয়েকে দেখতে গিয়ে চোখ ফেরাতে পারলেন না—দীপ্ত উজ্জ্বল শ্যামল রঙে অজন্তা

চিত্রের ছাঁদে কাটা যেন ছাঁচে ঢালা মাধুরীভরা মুখখানি, মুহূর্তে দৃষ্টিতে মন হরে নেয় সবটা। বয়স উনিশ, কলেজে বি. এ পড়ে। সঙ্গে ছিলেন দেওয়ানজি, রূপেন্দ্রনারায়ণের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ পাকা কথা দেওয়া হোলো। নাম জানা গেল মঞ্জুমালিকা। রূপেন্দ্রনারায়ণের মনখানাতে যেন সংগীতের ঝরনা ঝরে পড়ল নাম শোনার সঙ্গে। মঞ্জুর বাপ হাতে পেলেন স্বর্গ, জমিদার জামাই, বি, এ পাশ, রূপে দিক আলো।

দিন স্থির করবেন গিন্নিমা একথা জানিয়ে দেওয়ানজি পাত্রদল নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। অবিলম্বে দিন স্থির—বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল উভয় পক্ষের। ডাক্তার বাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, খরচ করতে পারবেন না বেশি, পাত্রপক্ষে লক্ষটাকা ব্যয় ধার্য হয়েছে। জমিদার বাড়ি ধূমধাম লেগেছে বেজায়। রাস্তাঘাট পাকা করা বাড়িঘর মেরামত আগেই হোলো শুরু। গহনা কাপড় কেনার ধূমও কম নয়। গিন্নিমা ব্যস্ত সারাক্ষণ। সন্দেশ, মেঠাই, দই, ক্ষীরের বায়না দেওয়া হোলো কলকাতার বড়ো দরের ভিয়েনকর ও স্বর্গীয় কর্তার আমলের ঘোষপাড়ার নিতাই গয়লাকে ডেকে। জেলে, কলু, মালী ও গেঁয়ো ময়রার দল আনাগোনা করছে বাড়িতে। মন-ওজনের মাছের বায়না জেলে, কলু তেলের, গেঁয়ো ময়রা চিড়ে মুড়কি ও মালী নিচ্ছে ফুল মালার বায়না। নহবৎ খানায় নহবৎ বসবে, কলকাতা থেকে কনসার্ট ব্যাণ্ডের দলও আসবে, অভিনয়ও হবে একদিন, বাদ যাবে না কিছুই। জমিদার বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। দারোয়ানের সদ্দার গোপাল সিংএর সোনার কণ্ঠী, রাজাবাবুকে মানুষ-করা পুরোনো ঝিয়ের হাতের অনন্ত, গলার হার গড়াতে গেছে। একটা ক'রে সোনার আংটি পাবে বাকি সকল চাকর—সঙ্গে নূতন কাপড় তো আছেই। বৌরানী আসার দিন স্টেশন থেকে জমিদার বাড়ি পর্যন্ত বাঁধা রোশনাইয়ে আলো করা হবে

সারা পথটি। এমনতরো ধূমের বিয়ে গাঁয়ের লোক কোনোদিন দেখে নাই, এমন পরীরাজ্য কল্পনার খবর তারা কানেও কখনো শোনে নাই গ্রামসুদ্ধ সকলেই উন্মুখ, উৎসুক, উতলা।

পথের দুধারে রঙিন কাগজ আঁটা পাতার লতা জড়ানো বাঁশের খুঁটি বিশ হাত অন্তর পোঁতা তার ফাঁকে ফাঁকে আলো জ্বালা খাস গেলাসের ঝাড়, আলোক সজ্জায় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। জমিদার রূপেন্দ্রনারায়ণ বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন সেই পথে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাজি পুড়ছে, হাউই উড়ছে সাঁ সাঁ শব্দে আকাশ চমকে দিয়ে।

সদ্য ফোটা সাদা পদ্ম ও বড়ো বড়ো পাহাড়ি গোলাপে কেয়ারি সাজানো বরের মোটর চলছে ধীর গতিতে আগে আগে, রূপার গিলটি করা বৌয়ের পাল্‌কি পিছু পিছু। সেদিনের উৎসব-সমারোহ যে দেখল সে আর ভুলল না। রূপকথার কাহিনীর মতো এর গল্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

তিন

ছয় বৎসর কেটে গেছে। জলপানের দোকানখানি আগের মতোই গ্রামের লোককে জলপান জোগায়। আজকাল শিবরানী দোকানে বসে না, বড়ো হয়েছে। বুড়ো ঝি ছোকরা চাকর পালা ক'রে জিনিস বেচে। শহরের লোকদের ইদানিং এ গ্রামে আনাগোনা বেড়েছে আগের থেকে। জমিদার বাবু অনেক রকম শহুরে ব্যাপার গ্রামে এনে ফেলেছেন। সময় সময় সস্তাদরের সার্কাস বায়স্কোপের দল গ্রামবাসীদের আমোদ দিতে ও তামাশা দেখাতে আসে শহর থেকে।

কুটীর শিল্প, স্বাস্থ্যোন্নতি, ম্যালেরিয়া নাশ, সমবায় আন্দোলন, নারীজাগরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে প্রচার বিভাগের বক্তারাও এসে থাকেন বছরে অনেকবার। তাঁরা শহুরে খাবার পছন্দ করেন, জলপানের দোকান খানাতে আজকাল তাই আলুর দম লুচিরও আমদানি দেখা যায়। শিবরানীর মাকে ব'লে বুড়োঝি এই ব্যবস্থা করেছে। শহর-ফেরা গ্রামের লোক শহুরে খাবার খেতে শিখে পয়ামাসিকে ফরমাশ করে লুচি কচুরির। লাভের সংখ্যা বেশি বুঝে পয়ামাসি সেদিকেও মনোযোগ দেয়। মা মেয়ে দুজনেই আজকাল জলপান তৈরির কাজে লাগে তাতে জিনিস জোগানো যায় বেশি।

দুপুরে কাজ সেরে মা মেয়েতে বসেছে মাদুর পেতে দাওয়ায়। শিবরানী বলল, মা, বাবা এখন কোথায়। কোনো রকমে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না কি।

মায়ের বুকে চাপানো বড়ো একখানা পাথর নাড়া পেয়ে ব্যথা জাগিয়ে তুলল বুকের মধ্যে মেয়ের কথায়।

মা বললেন—চুপ কর্ রানী, ও কথা তুলিসনি, দেওয়ালেরও কান আছে। কী জানি কে শুনে ফেলবে।

রাণু থামে না—আবার বলে, বাবা কি কখনো ফিরবেন না মা। আমরা কি চিরদিন এই ভাবে কাটাব। আমার বড়ো মন কেমন করে তাঁর জন্যে। তাঁকে কতকাল দেখিনি।

—আমাদের মুখ বুজে থাকতে হবে রানী তাঁর সম্বন্ধে। তুই তখন ছোটো ছিলি—সব কিছু তো দেখিস নি।

—ছোটো থাকলেও মা, তাঁর চেহারা স্পষ্ট আমার মনে আছে। অন্য কোনো দেশে গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না কি। চলো না মা; আমরা অন্য কোনো দেশে যাই—ভালো লাগে না একটানা একজায়গায় থাকতে।

—নিষেধ আছে তাঁর। ব'লে গেছেন, এক জায়গায় স্থির হয়ে থেকো যত দিন আমি না ফিরি।

—কবে সে সময় হবে, বলো মা।

—ধৈর্য হারালে হবে না রানী, তোর জন্য আমি চিন্তিত আছি। তোর মনটা এমন করে আর চেপে রাখা যায় না; বৌরানী নূতন মেয়ে স্কুল খুলেছেন—সেখানে তোকে পড়তে পাঠাব ভাবছি।

—আমি পড়তে গেলে এত কাজ তুমি একলা করবে কী করে মা।

—কেন। সকাল বিকেলে তুই কতকটা কাজ করে দিবি, স্কুল তো দুপুরে।

বৌরানীর স্কুল বারটায় বসে তিনটায় ছুটি, গাঁয়ের মেয়েদের সুবিধার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। বুড়ো পণ্ডিত রেখেছেন, অঙ্ক শেখায়, বাংলা পড়ায়, ইংরেজি শেখান তিনি নিজে। নূতন একজন ট্রেনিং পাশ শিক্ষয়িত্রী এনেছেন শহর থেকে মেয়ের সংখ্যা বেড়েছে ব'লে।

—তুই গেলে তোকে যত্ন করেই পড়াবেন, কালই তোকে পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে ; তুই এমন মনমরা হয়ে থাকিস না।

পরদিন দুপুরে খাওয়া সেরে মা বুড়ো ঝিকে ডেকে বললেন, প্রয়াগী, রানীকে সঙ্গে করে বৌরানীর স্কুলে নিয়ে যা। সেখানে সে ভর্তি হবে। কাল থেকে স্কুলের ঝি আসবে নিতে, তোকে আর যেতে হবে না।

শিবরানী ঝি-মায়ের সঙ্গে চলল স্কুলের দিকে বড়ো খুশি মনে।

চার

গ্রাম থেকে ক্রোশ পাঁচছয় দূরে একটি বড়ো নদী; তার তীরে মনোমতো জায়গা বেছে রূপেন্দ্রনারায়ণ নূতন একখানি বাংলো তৈরি করেছেন—নাম "মঞ্জুকুঞ্জ"। প্রীতির চিহ্নটুকু আঁকা রয়েছে নামের সঙ্গে পাথরে সোনার অক্ষরে।

ঐশ্বর্যভরা সংসার, আতিশয্যভরা স্বামীর ভালবাসা—মঞ্জুমালিকা সুখী সকল দিকে। বাপ-মা পরিতৃপ্ত এমন ঘরে এমন বরে মেয়ে দিয়ে। বিয়ের পর মঞ্জু বাপের বাড়ি একটি রাতও কাটায়নি। ছোটো বাড়ি, রাজা জামাইয়ের থাকার অসুবিধা, মোটরে আসে মঞ্জু স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ি সকালে, সন্ধ্যায় আবার ফিরে যায়। বাপ মা মেয়ে জামাই চোখে দেখেই সন্তুষ্ট থাকেন।

মঞ্জুমালিকার মনটি বড়ো নরম, যেন রেশমি সুতার গোছা—আশ্রয় নিলে আরাম পাওয়া যায় খুব, বাঁধন নিলে ছেঁড়া যায় না সহজে। সব মনটুকু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে সে স্বামীকে—ভরে গিয়েছে হৃদয়খানা অপূর্ব চেতনায়।

ভরা হৃদয়ে মঞ্জু শাশুড়ির সেবা করে—পূজার সজ্জা সাজায়—দুপুরে হবিষ্য চড়ায়,—খাওয়ার সময় বসে গাওয়া ঘি নুন নেবু দুধ মিষ্টি এগিয়ে দেয় তাঁর পাতের কাছে পরম যত্নে। শাশুড়ির সেবার কাজটি ছেড়ে মঞ্জুকুঞ্জে যেতে মঞ্জুর মন সরে না। রূপেন্দ্রনারায়ণ ঝোঁক ধরলে যেতে হয়—উপায় কী না গিয়ে।

মঞ্জু বলে—মা, চলুন না আমাদের সঙ্গে সেখানে। ফাঁকা জায়গা, বড়ো নদী, দেখলে ভালো লাগতে পারে। বাড়িতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠিত। দেবার্চনা ছেড়ে মা একপা নড়বেন না। একাদশী অমাবস্থা পূর্ণিমা তিথিগুলিতে ছুচারবার মাকে মোটরে নিয়ে গিয়ে মঞ্জু বাংলো দেখিয়ে ও নদীতে স্নান করিয়ে এনেছে।

ছেলের শৌখীন বিলাসরুচি ও অপরিমিত ব্যয় বাহুল্যের বহর দেখে মা বিস্মিত হন, ভাবেন, না জানি এ কত টাকার কাজ। তবে এসব ব্যাপারে তাঁর মন বসে না বেশি। শিক্ষিত ছেলের শখের ওজন বোঝা—রুচির বিচার করা তাঁর কর্ম নয় ভেবে নিজের দৈনিক অভ্যাসগুলিতে মন দেন বেশি করে। ছেলে বৌ নিয়ে সুখে আছে, এতেই তিনি নিশ্চিন্ত।

দেওয়ানজি কিন্তু ভরসাভাঙা গতিক দেখে—এত খরচ! এ যে দেউলে হবার ব্যাপার। রূপেন্দ্রনারায়ণের এক-ঝোঁকা মন ঝুঁকে পড়লে একদিকে, বাগ মানে না কোনো মতে, তিনি জানেন।

মাকে ভক্তি, দেওয়ানজিকে সম্মান, কর্মচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার রূপেন্দ্রনারায়ণের চিরাগত অভ্যাস—বংশের ধারা। তা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন না কখনো, কিন্তু নিজের ইচ্ছার গতি রুখতে পারেন না এক তিলও কারো কথায়, কোনো কারণে কারো মুখ চেয়ে। তাঁর ঝোঁকের মুখে পড়লে ঘা খেয়ে ফিরতে হয় সকলকে। দেওয়ানজি তাই খরচের খবর শোনাতে চান না সহজে। বউরানী প্রতিকথাটি নরমস্থরে কন, মেজাজ না বিগড়োয় ভেবে। ভালো মেজাজে রূপেন্দ্রনারায়ণ মাটির মানুষ—মায়ের কাছে ছোটো ছেলে।

নদীর বুকে বোট ভাসানো, শীকারে যাওয়া বৌরানীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো,শহরের বন্ধুদল নিমন্ত্রণ করে এনে ভোজ খাওয়ানো, ছুপুরে তাসের আড্ডা জমানো তাঁর মুঞ্জুকুঞ্জের এলাকায় শখের সরঞ্জাম। রং-বেরংএর পাখি ও দামি দামি বিদেশী কুকুর পোষার শখও তাঁর কম নয়। মঞ্জুকুঞ্জে নিত্য নূতন পাখি কুকুরের আমদানি দেখা যায়।

দশখানা গাঁয়ের লোক দেখতে আসে রাজাবাবুর শখের মঞ্জুকুঞ্জ—বলে, রাজাবাবুর নজর বটে। তাঁর দৌলতে দেখলুম নূতন কারখানা।

বৌরানীর শখ মেটাতেও রূপেন্দ্রনারায়ণের কৃপণতা নাই এতটুকু। তাঁর মেয়েদের শেখানো, গ্রামে মেয়েস্কুল করার ইচ্ছা দেখে তৎপর হয়ে সে ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

স্বর্গীয় কর্তার আমলে গ্রামে একটি মাইনার স্কুল বসে। স্কুলটির ভালোরূপ উন্নতি করে তোলার আগেই তিনি স্বর্গে যান। গ্রামের মুরুব্বিরা রাজাবাবুকে ধরে পড়ল স্কুলটিকে হাইস্কুল করে দিতে। শোনামাত্র আবেদন মঞ্জুর। দিলখোলা রূপেন্দ্রনারায়ণের—দিতে বাধে না কিছু কাউকে। কেবল তহবিলের দিকে নজর দেন না কখনো। দেওয়ানজির উপর হুকুম হোলো,বর্তমান মাস থেকে একশ' টাকা মাসিক সাহায্য ও বাড়ি তৈরি ও সরঞ্জামাদি কেনার জন্য এককালীন দশ হাজার। মুরুব্বিরা সই করিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে গেল। দেওয়ানজির কাছে খবর পৌছল টাকা দেওয়ার। প্রমাদ গনলেন দেওয়ানজি। ব্যাঙ্কের খাতায় জমার ঘর ফাঁক—উপরি ধার টানা হয়েছে বেশ কিছু। নূতন কিস্তির আদায় না হোলে নগদে কোনো খরচই চলবে না। কথাটা ফাঁস হোলে মনিবের মাথা হেঁট—ভেবে চিন্তে বললেন—তিন দিন পরে টাকা পাবে।

ওদিকে বৌরানীমার মেয়ে স্কুলেও মাসিক ৫০ টাকা দিতে হবে, সরঞ্জাম সামান্য, দু' একশ'য় মিটে যাবে। পাকা বুদ্ধির প্রবীণ দেওয়ান ঠাওরালেন একটা উপায়। পরদিন সকালে গিন্নিমায়ের পূজা জলখাওয়া শেষ হয়েছে খবর নিয়ে গিয়ে হলেন হাজির তাঁর কাছে। বললেন—স্বর্গীয় কর্তার নামে গ্রামের মাইনর স্কুলটি হাইস্কুল করে তোলা হচ্ছে—নগদ দশহাজার ও মাসিক ১০০৲ টাকা বরাদ্দ হওয়া চাই আপনাদের এই রাজসরকার থেকে। রাজাবাবুর বড়ো ছাতি, এ দান তাঁর কাছে যৎসামান্য বাপের ছেলে তিনি, সই করেছেন চাঁদার খাতায়—খুশি হয়ে। তহবিলে

কিন্তু মা টাকা নাই আদৌ। কথাটা কেউ জানতে না পারে—শুধু আপনাকেই শোনালুম। স্বর্গীয় কর্তার নামের কাজ ক্ষুণ্ণ হোতে পারে না কোনোদিকে। আপনি এর ব্যবস্থা করে দিন। স্বামীর নাম শোনা মাত্র গিন্নিমা উঠে গিয়ে সেকেলে বড়ো লোহার সিন্ধুকটি খুলে তদ্দণ্ডে দশ হাজার টাকার নোট দেওয়ানজির হাতে গুণে দিলেন। মাসিক টাকার অর্ধেক মা দেবেন অর্ধেক স্টেট থেকে দেওয়া হবে, ব্যবস্থা হোলো।

বৌরানীকে বলে ঠিক করলেন, আপাতত তাঁর হাত-খরচ থেকে মেয়েস্কুলের টাকা তিনি দিন, নতুন কিস্তি আদায় হোলে সে টাকা তাঁকে ফেরত দেওয়া হবে।

কাজ হোলো হাসিল—দেওয়ানজির বুদ্ধি কৌশলে। রাজাবাবুর গায়ে আঁচ লাগল না এতটুকু। গ্রামের লোকেরা রূপেন্দ্রনারায়ণের হাইস্কুলের উদ্বোধন সম্পন্ন করল ঘটা করে। জেলার কালেক্টার, ডেপুটি, মুনসেফ্ ও আশপাশের ছোটো ছোটো জমিদার বাবুরা এলেন সদলে। তাঁদের আদর আপ্যায়ন জলযোগের ব্যয় চাপল রাজাবাবুর ঘাড়ে, বলা বাহুল্য।

দেওয়ানজি ভাবছেন, খেয়ালের ঝোঁকে খরচ, নিজের মনকে আরামে রাখার, উপভোগের নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করার চেয়ে এসব কাজ হাজারগুণে ভালো। এতে যদি ধারও হয় তবু সেটা সওয়া যায়। প্রজার টাকা প্রজাই ফিরে পায় অনেকটা এতে—সেটা মঙ্গল। মরিয়া হয়ে ফুঁ দিয়ে টাকা উড়িয়ে দেওয়ার ঝোঁকটা রাজবাবুর ক'মে এদিকে ঝোঁক পড়লে তিনি বাঁচেন—এতে আর কতই খরচ হবে।

পাঁচ

গ্রামে আজ ম্যাজিক লণ্ঠন লেকচার। গ্রাম্য জল পানের দোকানখানার পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় সামিয়ানা টাঙিয়ে স্কুলের ছেলের দল লণ্ঠন লেকচারের আয়োজন করেছে। সন্ধ্যার আগেই ছেলেরা জড়ো হয়ে হৈ চৈ শুরু করেছে। ছবি দেখায় ছেলেদের মন নেচে ওঠে—স্ফূর্তি জাগে সবার মনে। ছবি দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে মেয়েরাও গিয়ে বসে চিকের আড়ালে। শিবরানী সকাল থেকে আবদার ধরেছে—সে লেকচার শুনতে যাবে মাকে সঙ্গে নিয়ে। এত বড়ো মেয়ে একলা পাঠাবেন না মা, সে জানে। শনিবার হাফ্ স্কুল—বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সেরে নিল সে ব্যস্ত হয়ে। ঝিমাকে বলল, সন্ধ্যায় তুই বাড়ি আগলে থাকিস, আমরা লেকচার শুনতে যাব। মা মেয়ে দুজনে গিয়ে চিকের আড়ালে বসলেন।

পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত সুবরেণ্য রায় চৌধুরী এম এ বক্তৃতা দেবেন 'গ্রাম সংস্কার ও কৃষক উন্নতি' সম্বন্ধে। লোক জড়ো হয়েছে অনেক; সকলেই শোনবার জন্য উৎসুক। কৃষিবিদ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞান বেশ পাকা। বোম্বাই কৃষি কলেজে শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর বলার ভঙ্গীটি নূতনতরো। সকলের মনে বসে স্পষ্ট হয়ে—ধারণা করে সবাই সহজে।

মা-মেয়ে দুজনের বড়ো ভালো লাগল বক্তৃতা, অনেক বিষয় জানা গেল কথাগুলি শুনে। বক্তার সুন্দর শ্রীটিও তাঁদের মনকে টানল তাঁর দিকে। বেশ সুষ্টু ভাব। শোনা গেল মাস ছয়েকের জন্য তিনি এ গ্রামের কাজ নিয়ে এসেছেন গ্রাম সংস্কারে গ্রামবাসীদের সাহায্য

করবেন ব'লে। কাছেই বাসা, পয়ামাসির দোকানে খাবার কিনতে এসেছেন পরদিন দেখা গেল। পয়ামাসি ভাব ক'রে নিল দু'দণ্ডে, জেনে নিল তাঁর খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। নিজে কুকারে রেঁধে খান দুপুরে। বিকেলে পয়ামাসির দোকানে রোজ লুচি তরকারি কিনবেন—পয়ামাসি বরাদ্দ করে নিল। লোক পটাতে পটু সে খুব। গায়ে পড়ে বলল, ছোকরা চাকরটা খাবার তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে তিনি আসতে না পারলে। আপ্যায়িত হলেন তিনি খুব, একটা ঝঞ্চাট থেকে বাঁচলেন। দোকানের খাবার ভালোই—দেখে নিলেন।

পাবলিসিটি অফিসারের নাম ছড়াল অল্পদিনে গ্রামের মধ্যে। ছেলে বুড়া সকলেই তাঁর নাম জেনে গেল—পশার জমল সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে।

ছোটো জাতের লোকেরা এসে জড়ো হয়ে পরামর্শ চায়,—বুদ্ধি দেন তিনি তাদের উন্নতির পথ পাবার। ভদ্র গৃহস্থরা শিক্ষা উন্নতির পরামর্শ নিতে, চাষীরা চাষ আবাদের অভাব অভিযোগ জানাতে আসে দলে দলে। কথা কয়ে বাড়ি ফিরতে সময়ে সময়ে তাঁর রাত হয়ে পড়ে বেশ। পয়ামাসির ফরমাশ মতো ছোকরা চাকরটা ঘরে গিয়ে খাবার রেখে আসে ডালা চাপা দিয়ে। দু' তিন দিন উপর্যুপরি খাবারগুলো ডালা ঠেলে জানালা ডিঙিয়ে বেরাল এসে খেয়ে গেছে দেখে সকালে দোকানে গিয়ে পয়ামাসিকে বললেন—আজ তিন দিন আমার কপালে রাতে খাবার জুটছে না রাতে ফিরে শুধু একটু চা তৈরি করে খেয়ে শুয়ে পড়ি। সকালে আসতে পারিনে কাজের চাপে। কী ব্যবস্থা করব ভাবছি। ব্যবস্থা পয়ামাসির জিহ্বাগ্রে। তখুনি জুগিয়ে গেল কথা,—আমার নিজের একখানা ছোটো ঘর আছে বাড়ির ভিতরের দিকে একপাশে, সেখানে খাবার ঢেকে রাখলে যখনি আসেন খেতে পাবেন—ভাবনা থাকবে না। ব্যবস্থা হয়ে গেল সেদিন থেকে।

শিবরানীর মায়ের মমতা পড়েছে ছেলেটির প্রতি। বাবুটি জ্ঞান বুদ্ধিতে যত প্রবীণ বয়সে তত নন। অনুমান ছাব্বিশ সাতাশ হবে। যত্ন করে খাবার করেন শিবরানীর মা, থালাটি ধরে দেয় বুড়োঝি প্রয়াগী। পরের বাড়ি এসে খাওয়া—রাত করেন না আজকাল তিনি প্রায়ই। হুঁস রাখেন ফেরবার। যাতায়াতে পরিচিত হয়ে পড়লেন মায়ের সঙ্গেও কিছুদিনে। মা আজকাল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কন।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত শিবরানীর মুখের দিকে চেয়ে মা ভাবেন—তোকে এমন ছেলের হাতে দিয়ে যেতে পারলে আমি মরে সুখ পাই; কে জানে তোর বাবা ফিরবেন কি না। অজ্ঞান বালিকা তুই—সংসারের কিছু জানিস না; আমি মরলে কোথায় দাঁড়াবি ভেবে ভয় জাগে মনে আমার সর্বদা। ভগবান কী থেকে কী করলেন, কোথায় এনে দাঁড করালেন—শেষে কী আছে কপালে কে জানে। জাতকুল না জানলে বাপ পিতামহের নাম না শুনলে কার মেয়ে, বিয়েই বা করে কে। মনের কথা চেপে রেখে মা কাজ করে চলেন নিয়মিত। দিন কাটে, শিবরানীর পড়া এগোয় স্কুলে। জমিদার বাড়ি নূতন উৎসবের পালা পড়ল; বৌরানীর খুকি হয়েছে আজ কয়দিন। ঢাক ঢোলের বাদ্য তেল হলুদের ছড়াছড়ি গ্রাম জুড়ে। বৌরানী অপারক হয়ে আই এ পাশ শিক্ষয়িত্রী এনেছেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস করে। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলেই আবার তিনি স্কুলে যাতয়াত শুরু করবেন ভেবে রেখেছেন।

ছয়

বছরখানেক ধরে বৌরানী বড়ো একটা মঞ্জুকুঞ্জে যেতে পারেন না—শরীর খারাপ। একলাই রূপেন্দ্রনারায়ণ আজকাল বন্ধুদল নিয়ে মঞ্জুকুঞ্জে হৈ চৈ করে হপ্তা কাটান। দেওয়ানজির কল্পনা এক্ষেত্রে ব্যর্থ। ভেবেছিলেন—কাজের দিকে মন ফেরালে রাজাবাবুর খরচ করা ধাতটা হয়তো কিছু বদলাবে। কিন্তু কাজে তা হোলো না। এদিকেও খরচ ও-দিকেও খরচ। শহরে গেলে খরচা আরো চতুর্গুণ। দেনা দাঁড়িয়েছে, গিন্নিমা বৌরানী জানতে পারেন না; কথাটা দেওয়ানজি চেপে রাখেন। মঞ্জুমালিকা আজকাল স্বামীকে ঘরে পান না সব সময়ে। খুকিকে কোলে নিয়ে আদর করে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন—সফল হন না। বলা চলে না কোনো কথা, তাতে মেজাজ খারাপ হয় আরও বেশি স্বামীর।

খুকির অন্নপ্রাশন; রাশীর যোগে গিন্নিমা নাম রাখলেন রাসেশ্বরী—মঞ্জুমালিকা বড়ো সাধে নাম দিলেন পুষ্পকলিকা, পুষু হোলো খুকির ডাক নাম। রাজাবাবু ধুম লাগালেন, বন্ধুদল নিয়ে বাড়িতে। গিন্নিমা করলেন কাঙালী বিদায়, বৌরানী খাওয়ালেন, নূতন কাপড় দিলেন স্কুলের ছাত্রীদের—রাজাবাবু নাচতামাশার বহর বাড়ালেন অতিমাত্রায়। দেওয়ানজি কূল পান না কোনোদিকে। আজন্ম এই পরিবারের খেয়ে তিনি মানুষ; পরিবারটা আজ ডুবতে বসেছে; দুর্ভাবনায় তাঁর ঘুম হয় না রাতে।

সরস্বতী পূজা, স্কুলের ছাত্রীরা পূজার আয়োজন করেছে। শ্বেতপদ্মে আসীনা সুন্দর সরস্বতী মূর্তি সামনে রেখে তারা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে

বাসন্তী রংয়ের শাড়িপরা। বৌরানীকে সামনে না রেখে তারা অঞ্জলি দিতে চায় না। শিক্ষয়িত্রী শিবরানীর দিকে চেয়ে বললেন, যাও তো শিবু, বৌরানীকে ডেকে আনো।

ষোলো বছরের শিবরানী সোনাঢালা রং, কৈশোরের কান্তিটুকু দেখা দিয়েছে দেহমনে অপূর্ব সুন্দর হয়ে। পিঠ ছেয়ে ছড়িয়ে আছে কালো চুলের রাশ। স্নান করেছে সকল মেয়ে সকালে উঠে। ভিজে চুলে ফুল পরেছে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে সংগ্রহ করে। বাসন্তীসজ্জায় সজ্জিত বীণাপাণির এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি যেন বীণাঝংকারে বেজে উঠবে বাণীর বরে। আলপনা চিত্রে চিত্রিত উঠান খানির সজ্জাও কম নয়।

দেউড়ি ছেড়ে তিনটি উঠান পেরিয়ে শিবরানী চলল বৌরানীর মহলে। বৌরানী আছেন শোবার ঘরে; দরজায় পৌঁছে কার গলার স্বর শুনে শিবরানী থমকে দাঁড়াল।

—না গেলেই নয়?

—দরকার আছে, যেতেই হবে।

—পূজার দিন ছেলেরা তোমাকে চায়; চলে গেলে দুঃখ পাবে উৎসাহহীন হবে।

—যাবার সময় যাব দেখা করে।

—থেকেই যাও না আজকার দিনটা।

—সে আর হয় না—সেখানে অনেকগুলো এনগেজমেণ্ট আছে।

—আমার একেবারেই ভালো লাগবে না।

—পরশু ফিরব, দেরি হবে না।

রূপেন্দ্রনারায়ণ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে দরজার সামনে শিবরানী দাঁড়িয়ে—কী রূপোজ্জল মূর্তি। বিস্ময়মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন রূপেন্দ্রনারায়ণ—বুঝলেন, স্কুলের ছাত্রী—জিজ্ঞাসা করলেন—

—তোমার নাম কী।

—শিবরানী—

—থাকো কোথায়।

—দক্ষিণ পাড়ায়।

—স্কুলে পড়ো বুঝি ?

—হাঁ—

—কী চাও।

—বৌরানীকে নিয়ে যাব।

—ঘরে আছেন—গিয়ে বলো।

শিবরানী ঘরে গিয়ে ঢুকল। রূপেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে চললেন বাইরের ঘরে।

বৌরানী খাটে বসে, মুখখানি একটু লাল, চোখ দুটিতে জলের রেখা। প্রণাম করে রানী বলল—বৌরানী মা, মেয়েরা, দিদিমণিরা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি গেলে অঞ্জলি দেবেন।

—চলো—ব'লে মুখে একটু জল দিয়ে চললেন বৌরানী শিবুর সঙ্গে স্কুলবাড়ির দিকে।

ভরা উৎসাহে বাণীর পূজা হোলো শেষ। জলযোগে তৃপ্ত হয়ে মেয়েরা কতক গেল বাড়ি—বড়োরা শিক্ষয়িত্রীরা রান্নার কাজে লাগলেন, রাতে খাওয়া। মেয়েরা অভিনয়ও করবে "গুরুদক্ষিণা"।

সন্ধ্যায় শোনা গেল রাজাবাবু আজ কলকাতায় যান নাই। মেয়ে-স্কুলের ছাত্রীদের অভিনয় দেখতে চান—বৌরানীকে বললেন।

রাজাবাবু রয়ে গেলেন, বৌরানীর বুকটা আনন্দে ভরে উঠেছে। অভিনয়ের ছাত্রীদের সাজাচ্ছেন নিজহাতে সুন্দর করে।

অভিনয় হোলো মন্দ নয়, আবৃত্তি গান বালিকাদের মুখে মিষ্টি শোনাল। রূপেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টি আবদ্ধ শিবরানীর রূপের দিকে। মনটা উন্মনা।

রাতে বৌরানীকে বললেন—তোমার ঐ সুন্দরী ছাত্রীটি কোথাকার মেয়ে।

—এই গ্রামেই থাকে—মেয়েটি খুব ভালো, দুবছর পড়েছে এতেই অনেক শিখেছে। দেখলে তো কেমন আবৃত্তি করল। গান গাইল!

—হুঁ—

সাত

পাবলিসিটি অফিসার স্থবরেণ্য চৌধুরীর গ্রামে প্রতিপত্তি খুব। তাঁর বিদ্যা গুণের সমজদার জুটেছে অনেকগুলি। তাদের আগ্রহ ও কাজের স্থফল দেখে কর্তৃপক্ষকে লিখে তিনি আরো তিনমাস সময় বাড়িয়ে নিলেন সেখানে থাকার। কাজ করে নিজে আনন্দ পান লোকগুলিও সন্ধান পায় নূতন নানা কাজের। নূতন ধাঁচের তাঁত বসেছে গ্রামে কয়েকখানি। গাই গরু ও বলদগুলির পুষ্টি সাধন করতে শেখাচ্ছেন তিনি নূতন প্রণালীতে। চাষের জমিতে ফসল ফলাবার জন্য সার তৈরির ব্যবস্থা দিচ্ছেন বৈজ্ঞানিক কৌশলে। নূতন কথা শুনলে, নূতন কিছু দেখলে মানুষের আনন্দ না হয়ে পারে না। সবাই উৎসুক নূতন কিছু শিখতে।

বক্তৃতার সঙ্গে হাতে কলমে কাজ দেখিয়ে চৌধুরী চোখ ফুটিয়ে দিচ্ছেন গ্রামের লোকের। ক্ষেতে গিয়ে তিনি নিজের হাতে বীজ ছড়ান, চাষীরা অবাক হয় তার অভ্যস্ত হাতের কায়দা দেখে। শিক্ষিত লোকের চাষ-আবাদে নজর চাষীরা পূর্বে দেখেনি কোনো দিন। তারা জানে গেঁয়ো চাষার কাজ কলম ধরা লোকেরা হাতে ধরে না। কাজের মধ্যে দিয়ে এঁ-কে যেন তারা নিজের মধ্যে আঁকড়ে পায়। চাষার ঘরে ভাতও খান তিনি দুপুরে অনেক সময়। রাতের খাওয়াটা পয়ামাসির কাছে থাকে ঠিক।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে চৌধুরী স্টোভে তৈরি গরম চা খান দুএক পেয়ালা; একটু আরাম করে বসে খেতে খেতে দেরি হোলে

পয়ামাসি ডাকতে আসে। খবর জানে, খেটে খেটে বাবু হয়রান হন খুব—বলে, বাবু, তোমার এত কাজ।

—কাজ না করলে চলে কি পয়ামাসি। অনেক খাটতে হবে তবে দেশের কাজ এগোবে।

—মা বলেন, ছোটোবড়ো সকল কাজে চৌধুরীবাবু তৎপর, কোনো কাজে হটেন না। ভদ্রলোকের ছেলে, বাবুগিরি নাই এতটুকু। মায়ের মুখে তোমার যশ ধরে না; বড়ো পছন্দ তোমাকে তাঁর।

—মায়ের মতো গুণবতী দুর্লভ; এতটুকু স্খলন নাই কোনোখানে; আলগা কথা একটা মুখে শুনি নাই কোনো দিন, মা খুব পরিশ্রম করেন না পয়ামাসি?

—হাঁ খুব, এক মুহূর্ত বসেন না; রানীও আমাদের মায়ের মতোই, —খাটে খুব; সারাদিন স্কুলে পড়াশুনা—রাত জেগে মায়ের সকল কাজে সাহায্য করে ষোলো আনা। রূপের ডালি মেয়ে—একমাস বয়স থেকে আমি তাকে হাতে করে মানুষ করেছি। বড়ো মায়া আমার বাবু তার উপরে। নাম তার শিবরানী, জানো তো বাবু?

চৌধুরী সে কথায় জবাব না দিয়ে বললেন—মায়ের বুঝি ঐ একটি মেয়ে?

—হাঁ—ওকেই ছয় বছরেরটি নিয়ে আমরা এ গ্রামে এসেছি। বাবু যে কোথায় গেছেন, কেউ তা জানে না। তাঁর খবর নাই অনেক কাল। মায়ের বুদ্ধিতেই এ সব কিছু চলছে।

চৌধুরী একটু চমকে গেলেন; বুঝলেন এদের মধ্যে একটা কিছু যেন চাপা আছে। মুদি চাষির ঘরে এমনতরো কেতাদুরস্ত ভদ্রছাঁদের চালচলন তো দেখা যায় না। মনের কথা মনে রেখে তিনি বললেন—চলো পয়ামাসি, খেতে যাওয়া যাক।

বাড়ি ঢুকে চৌধুরী দেখলেন, শিবরানীর মা উঠানে দাঁড়িয়ে কার

যেন অপেক্ষা করছেন। তাঁকে দেখেই বললেন—খুকির আজ বিকাল থেকে জ্বর এসেছে; সন্ধ্যার পরে বেড়েছে। আপনার কাছ থেকে একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। শুনেছি আপনি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন ভালো।

—চলুন, দেখে আসি—

—আগে খেয়ে নিন।

—রোগী দেখে ওষুধ দিয়ে স্থির হয়ে খাব।

—আপনাকে ব্যস্ত করলাম না তো?

—কিছু মাত্র না।

ছোকরা চাকর সামনে ছিল তাকে বললেন,—যাও তো আমার বাড়ি থেকে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এসো।

প্রয়াগী বলল—ও আবার ওষুধের বাক্স চিনবে? শিশি সাজানো ওষুধের বাক্স আমি চিনি। আনছি—ব'লে সে চৌধুরীর বাসার দিকে চলল।

সুবরেণ্য মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন রোগী দেখতে; জ্বর খুব—গা জ্বালা, মাথা ব্যথা, উপসর্গ তো আছেই। হাত দেখে জ্বরের গতি ইত্যাদি পরীক্ষা করে ঔষধের ব্যবস্থা করলেন, ইতিমধ্যে প্রয়াগী বাক্স এনে হাজির। একবার ওষুধ খাইয়ে দুবারের রেখে চৌধুরী বেরিয়ে এলেন, বলে এলেন,—কাল সকালে খবর দেবেন, কেমন থাকেন।

খাওয়া সেরে বাসায় গিয়ে মা মেয়ের কথাটা চৌধুরীর মাথায় কেমন ঘুরতে লাগল। কে জানে এরা কোথাকার মানুষ, কী পরিচয়ে এখানে বাস করছে, মুদির দোকান চালায় বটে কিন্তু জাতে মুদি একথা বলতে তো কাউকে শোনা যায় না। পাড়ায় এদের সুস্পষ্ট পরিচয় কারো জানা নাই, ছয়মাসে এটা তিনি বুঝেছেন। মায়ের প্রতি কথায়

ব্যবহারে একটি বিশিষ্ট সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠে। মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী —এরা বড়ো ঘরানা না হয়ে যায় না। কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া হোতে লাগল অনেকক্ষণ। পরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে রোগী দেখতে চললেন চৌধুরী ওষুধের বাক্‌স হাতে ঝুলিয়ে। মস্ত বড়ো হাতল দেওয়া মজবুত চামড়ার বাক্‌সটি নতুন আমেরিকার আমদানি। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন—পয়ামাসি, বাড়ি আছ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বুড়োঝি প্রয়াগী বেরিয়ে বলল—আসুন বাবু, আসুন; মা আপনার পথ চেয়ে আছেন। রানী একটু ভালো আছে, তবে জ্বরটা একেবারে ছাড়েনি। মা এসে চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঘরের ভিতর। শিবরানী তক্তায় শুয়ে, গলাপর্যন্ত একখানি বালাপোষ দিয়ে ঢাকা একরাশ চুলের লম্বা বিনুনি বালিশের ওপর দিয়ে তক্তা ছাড়িয়ে ঝুলছে।

জ্বর ছাড়েনি, মুখ তখনো থমথমে। তক্তার পাশে একটি বাঁশের বড়ো মোড়ায় বসলেন চৌধুরী; নাড়ী টিপে, রাতের অবস্থা জেনে, উপসর্গের লক্ষণ বুঝে নূতন ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। পথ্য বার্লির জল, মিশ্রী, পাওয়া গেলে দুচার কোয়া কমলালেবু দিতে পারা যায়—সন্ধ্যায় খেতে এসে আবার দেখে যাব বলে উঠে পড়লেন। তাঁর অনেক কাজ সময় দিতে পারেন না একটা কাজে বেশি। মা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখলেন?

—কম আছে, এখনো তিনচার দিন লাগবে।

সাতদিনে শিবরানী সম্পূর্ণ সেরে উঠল। আরো হপ্তাখানেক কেটে যাবার পর মা একদিন চৌধুরীবাবুকে বললেন, কাল দুপুরে আপনার নিমন্ত্রণ আমাদের বাড়ি। আমরা ব্রাহ্মণ, ভাত খেতে ভয় পাবেন না আমাদের হাতে।

—আমি দুবেলা চাযার অন্ন গ্রহণ করে থাকি; আমার আবার

জাতি বিচার। ব্রাহ্মণের ছেলে বটে কিন্তু নিজেরা ছিটকে পড়েছি অনেক দূরে। কাজ করা যায় না বেশি জাত বাঁচালে।

মা বুঝলেন, চৌধুরী ব্রাহ্মণের ছেলে; চৌধুরী বুঝলেন এরা ব্রাহ্মণ পরিবার। উভয়েরই মনটা কেমন সাড়া দিল এই পরিচয়ে।

পরদিন রান্না করলেন মা অনেক পদ। সিন্ধুকে তোলা পুরোনো একখানি শ্বেত পাথরের থালা বের ক'রে অন্ন সাজালেন পরিপাটী করে। বাটির ব্যঞ্জনও অনেকগুলি। পায়স পিঠে আগের রাতে করে রেখেছেন, রান্নাঘরের তাক্‌এ তোলা সেগুলি যত্ন করে।

খেতে বসেছেন চৌধুরী, মা কাছে বসে খাওয়াচ্ছেন। অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা, পরিবেশনের পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতায় উন্নত রুচির পরিচয় পেয়ে একদিকে তিনি যেমন পরিতৃপ্ত হলেন তেমনি প্রত্যয় দৃঢ় হোলো যে নিশ্চয়ই এরা বনিয়াদি বংশ।

রোগী দেখতে যখন তিনি ঘরে ঢুকতেন দেওয়ালে একখানি ফটো টাঙানো দেখেছিলেন এক ভদ্রলোকের—সুন্দর—সুপুরুষ। অনেকবার মনে হয়েছে, হয়তো বা ইনিই মেয়েটির বাবা। খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে, মা ডাকলেন—রানী, পিঠা পায়সের বাটি দুটি নিয়ে আয়। রেকাবিতে রসবড়া সরুচাকলি আছে তাও আনিস।

হেঁটমুখে শিবরানী পিঠে পায়সের রেকাবি বাটি এনে পাতের কাছে নামিয়ে দিল। মা বললেন, মশলা ঠিক করে রাখিস। শিবরানী ঘরে গেল, কৌটায় মশলা ভরে আনতে। মা বললেন—আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজনীয় কথা আছে, অবসর মতো বলব।

—কাল আসব বৈকালে।

আট

ভাগ্যস্থানে যখন কুগ্রহ ভর করে তখন কুপরামর্শ দিতে, কুবুদ্ধি জোগাতে কুলোক জড়ো হয় মানুষের চারিপাশে, অনেক। ঘিরে ফেলে তাকে শনির শ্যেনদৃষ্টি।

রূপেন্দ্রনারায়ণের ভাগ্যফলে শনি ঘনিয়ে এসেছিল সে সময় ষোলো আনা। শিবরানীর কৈশোর লাবণ্য তার মনকে বিকৃত করে তুলেছিল দিনে দিনে। ঠাট্টা তামাশা হাসি আলাপে কুবন্ধুরা কুবুদ্ধি জোগাচ্ছিল অহরহ। প্রশ্রয় পাচ্ছিল মনটা তার পাপের পথে। চিন্তা বিক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট কোনো কাজ হাতে নাই যাতে মনোনিবেশ করে মনকে বাঁচাতে পারে আপদ থেকে। সঙ্গীরা শপথ করে শোনায় ভয় নাই এ কাজে এতটুকু। মেয়েটির যাতায়াতের পথে তারা দৃষ্টি ফেলে প্রতিদিন। এলোমেলো ভাবে নানা কৌশল মনে আসে ওকে হস্তগত করার। ভদ্র সন্তান, ভরসা পান না অতিগর্হিত কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার। বুদ্ধি দিলেন এক বুদ্ধিমান বন্ধু, গোপনে বিবাহ করে ফেলুন না রাজা বাবু, সব গোল মিটে যাক—। ধনী লোকে ধনের দৌলতে কত কী করে। কথাটা রূপেন্দ্রনারায়ণের মনে লাগল। অনেক যুক্তি খাটাতে লাগলেন নিজের মনে এর পক্ষে। শেষে স্থির করলেন, চিরহিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারের পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারী সদাশয় মহাপ্রাণ দেওয়ানজির শরণাগত হওয়াই কর্তব্য। দেখা যাক তিনি কী বলেন।

দুপুরে খাওয়া সেরে বৈঠকখানায় ফরাশ বিছানায় শুয়ে আছেন রূপেন্দ্রনারায়ণ একা। জানালা দরজা বন্ধ, ঘরখানি ঝাপসা অন্ধকারে ঢাকা। গরম হাওয়া চলছে বাইরে। হাজির-থাকা চাকরকে ডেকে বললেন,

দেওয়ানজিকে খবর দে তো হরিধন। হরিধন ছুটল কাছারি ঘরের দিকে। দেওয়ানজি বসে কাগজপত্র দেখছেন, হরিধন ঢুকে বলল, রাজাবাবু খবর দিয়েছেন দেওয়ানজি।

—বলো, আসছি—ব'লে তিনি দরকারি কাগজগুলি তুলতে লাগলেন হাত বাক্সে। হরিধন দৌড়ে চলল দেওয়ানজির আসার খবর দিতে।

মিনিট কয়েক পরে দেওয়ানজি এলেন রাজাবাবুর ঘরে। অন্ধকারে রাজাবাবুর মুখ দেখা যায় না স্পষ্ট।

—বসুন দেওয়ানজি—আপনার শরীর ভালো আছে তো?

—আজ্ঞে হাঁ;

—বিষয় কর্মের ব্যবস্থাদি চলছে কেমন।

—ভালো নয়, মহালে আদায় কম, ব্যাঙ্কে দেনা চেপেছে অনেক। গত সনে উস্থলপুরের জমিদার বাবুদের কাছে ধার-নেওয়া লক্ষটাকার সুদ দেওয়া হয়নি আদৌ, আসল শোধ তো দূরের কথা। খরচ কমানো দরকার, বাজে লোক বেশি না পুষলেই ভালো হয়।

—ভাবছি, ওদের অনেকগুলোকে এবার বিদায় করে দেব: আমাকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে সে একমাত্র আপনি দেওয়ানজি। আমি থামাতে পারিনে নিজেকে কোনো কিছু থেকে। সামলাতে পারিনে ঝোঁক একবার চেপে পড়লে। একটা দুঃসাহসিক কাজের কথা বলতে চাইছি, ভয় পাবেন না—না শুনে। থামাতে যাবেন না দেনার ফর্দ দেখিয়ে, তর্ক তুলে বোঝাতে যাবেন না;—দোহাই আপনার। মনটা আমার ভরে উঠেছে একটা অস্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু তাড়াতে পারার উপায় নাই তাকে সোজাপথে তার প্রতীকার না করে।

—বলুন রাজাবাবু, কী চান আপনি; আমি এ পরিবারের অন্নে চির প্রতিপালিত। আপনার কল্যাণের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত সর্বদা।

—দেওয়ানজি, আমি বিবাহ করতে চাই।

—বি-বা-হ।—আপনার ?

—হাঁ—সে কি এমনই অসম্ভব।

—অসম্ভব—নিতান্ত অসম্ভব।

—কেন। অসম্ভব কিসে। পুরুষের একাধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কলির শেষে পৃথিবী উলটাবে—এটাও শাস্ত্রবাক্য। পৃথিবী উলটালে তার বিধিগুলি খাড়া হয়ে থাকতে পারবে কি সোজা। কলি শেষ হয়েছে, পৃথিবী বদলাতে শুরু করেছে। সূক্ষ্ম গতি তার চোখে পড়ে না, সকলের—

—আপনিও পাগল হোলেন দেখছি দেওয়ানজি, আমার সঙ্গে। পৃথিবী উলটাচ্ছে কোন্ দিকে। কলি শেষ হবে কখন। এসব প্রলাপোক্তিতে কী প্রয়োজন। ব্যবস্থা করুন, এই চাই—।

—বৌরানী মার গলায় ছুরি বসাবেন কোন সাহসে।

—তাঁর এতে কোনো কষ্ট হবে না; বিবাহ গোপনে হবে, গোপনে থাকবে চিরদিন। এ ঘরে তাকে আনা হবে না কোনোদিন কখনো।

—পাগলের কাণ্ড। এ কথা কে আপনার মাথায় দিয়েছে।

—কেউ নয়—আমি স্বয়ং।

—কার মেয়ে। কোথায় থাকে। খোঁজ দিলে কে।

—নিজের চোখ খুঁজে বের করেছে—গ্রামের মেয়ে স্কুলের ছাত্রী—সন্ধান করতে যেতে হয়নি কোনোখানে। নামটা আপনার কাছে বলতে মুখে বাধে। আপনি আমার পিতার তুল্য, বলুন কী উপায়।

—সর্বনাশ রাজাবাবু, ছেড়ে দিন ওকথা মন থেকে।

—অসম্ভব।

—ঘটানো আরো অসম্ভব।

—আপনি মনে করলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন, আপনার বুদ্ধিতে অসাধ্য সাধন হয়।

—সাধ্য নাই রাজাবাবু।

—আপনি উপায় না করলে আমাকে বিষ খেয়ে জীবন শেষ করতে হবে। বংশ লোপ হবে পূর্বপুরুষের নাম ডুববে—আপনি কি সেটা দাঁড়িয়ে দেখবেন।

—রাজাবাবু আমাকে অবসর দিন, বৃদ্ধ হয়েছি। নূতন লোক নিযুক্ত করুন কাজে।

—আমাকে মৃত্যুমুখে তুলে দিয়ে আপনি চলে যেতে চান। বাঁচাতে হবে আমাকে সেটা ভুলে যাবেন না। সময় দিলাম তিন দিন, ভেবে দেখবেন,—আজ আমি কলকাতা যাচ্ছি, সাতদিন পরে ফিরব। এর মধ্যে একটা বুদ্ধি ঠাউরে রাখবেন।

বেলা তিনটা, রাজাবাবুর মোটর চলে গেল কলকাতার দিকে। সন্ধ্যার পূর্বে বৌরানীর মহলে দেওয়ানজি উপস্থিত হলেন; মনটা চিন্তায় ভারাক্রান্ত।

পুরাতন ঝি রানীমাকে খবর দিল, দেওয়ানজি এসেছেন, দেখা করতে চান। বৌরানী তৎক্ষণাৎ উঠে বাইরে এলেন। শয্যায় শুয়ে ভাবছিলেন কত কী—মনটা তাঁর অস্বস্তিতে ভরা। দেওয়ানজি নমস্কার জানিয়ে বললেন

রানীমা, সমূহ বিপদ—তৎপর হয়ে প্রতিকার করা দরকার।

—বিপদ! কিসের—কার। কী করতে হবে দেওয়ানজি।

—বিপদ সকলের—আপনার, আমার, পরিবারের, গ্রামের। ভয়ে বিস্ময়ে বৌরানী বললেন, গুরুতর বিপদ নাকি। আমা হতে তার কী প্রতিকার হোতে পারে। আপনি পরিবারের পিতৃ-স্থানীয়। আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে কে। যা বলেন তাই করতে আমি প্রস্তুত।

—এখনি যেতে হবে আপনার স্নেহপাত্রী স্কুলের ছাত্রী শিবরানীর বাড়ি। সরাতে হবে তাদিকে গ্রাম থেকে এই দণ্ডে। অমঙ্গলে ঘিরছে তাদিকে—আপনাকে। সব দিক রক্ষা হবে তারা সরে গেলে।

বৌরানীর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মুহূর্তে। হাত পা কাঁপছে; দেওয়াল ধরে দাঁড়ালেন।—চলুন মা, গাড়ি দাঁড়িয়ে দেউড়িতে। সব আমি প্রস্তুত করে রেখেছি।

পাঁচ মিনিটে মোটর এসে পৌছল জলপানের দোকানের সামনে। দেওয়ানজি নেমে খবর দিলেন—রানীমা এসেছেন, ভিতরে যাবেন। পলকে পয়ামাসি দরজা ঠেলে বাড়ি ঢুকে উঁচু গলায় ডাক দিল,—রানী, দৌড়ে আয়, দেখ্ এসে কে এসেছে।

জানলা দিয়ে মা দেখলেন জমিদার বাবুর বড়ো মোটর বাড়ির সামনে। পথে দেওয়ানজি দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভিতরে বসে বৌরানীমা।

মা-মেয়ে দুজনে দৌড়ল গাড়ির দিকে। হাত ধরে নামালেন মা বৌরানীকে একান্ত যত্নে, সমাদরে। শিবরানী লুটিয়ে রানীমার পায়ে প্রণাম করল অন্তরের সব ভক্তিটুকু দিয়ে। তাঁর বিবর্ণ মুখখানির দিকে নজর পড়ল না তাদের—ব্যস্ত থাকায়।

দাওয়ায় এনে বসালেন আসন পেতে দেওয়ানজিকে। মোড়া দিলেন বৌরানীর জন্য, এই তাঁদের আসবাব। বৌরানীর আগমন একুটীরে আকস্মিক ব্যাপার। মনটা তাদের গুছিয়ে নিতে সময় লাগল একটু।

দেওয়ানজি শিবরানীর মাকে বললেন, আপনার সঙ্গে আড়ালে আমার কিছু কথা আছে। সরে গেলেন দুজনে পয়ামাসির রাতে-শোবার ছোটো ঘর খানার দিকে।

দেওয়ানজি বললেন—অমঙ্গলের আভাস জানাচ্ছি। প্রশ্ন করবেন না একটিও। বুকপকেটে রাখা নোটের তাড়া বের করে বললেন, নিন এই হাজার টাকার নোট। গ্রাম ছেড়ে চলে যান কালই।

শিবরানীর মা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অনুমানে অনেকটা বুঝতে পারেন।

আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কাল সন্ধ্যার পূর্বে আমি দূর গ্রামে চলে যাব নিশ্চিত।

দুটি কথায় কাজ শেষ। অন্তরের আশীর্বাদ জানিয়ে দেওয়ানজি হলেন অগ্রসর রাস্তার দিকে, মূহূর্ত দাঁড়াবার যেন ইচ্ছা নাই।

শিবরানীর হাত ধরে বৌরানীও এগোলেন পিছু পিছু। মোটর হোলো অদৃশ্য।

মা দেখলেন, মেয়ের হাতে দুগাছি নতুন বালা পরানো। মেয়ে বলল, মা বৌরানী আমাকে নিজের হাতের বালা দুগাছি খুলে পরিয়ে দিলেন! তাঁকে বড়ো অসুস্থ দেখাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না কিছু।

নয়

বিকালে আসব—ব'লে চৌধুরী বাবু সেই যে গেছেন পনর দিন আর দেখা নাই। সেদিন বাড়ি ফিরে কর্তৃপক্ষের "তার" পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে দূর গ্রামে কাজে চলে যেতে হয়েছিল। কাল রাত্রে ফিরেছেন—পয়ামাসি খবর জেনে এসেছে। আজ রাতে খেতে আসবেন তিনি যথা সময়ে, তাও পয়ামাসিকে বলেছেন। শিবরানীর মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে বললেন—যা তো প্রয়াগী শীঘ্র চৌধুরী বাবুকে ডেকে আন্। ঘণ্টা খানেক পরেই তিনি আসতেন—ডাক শুনে তাড়াতাড়ি চলে এলেন।

—আজ রাতেই আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাই। সে বিষয়ে আপনার কোনো সাহায্য পেতে পারি কি।

—নিশ্চয়—যাবেন কোথায়।

স্থিরতা নাই—বেরিয়ে পড়ি তো এখান থেকে।

—আজ ভোরের ট্রেনে আমাকে বাড়ি যেতে হবে, সাতদিনের ছুটি। সেখান থেকে বোম্বাইএ পাঠাচ্ছে আট মাসের জন্য। ইচ্ছা হোলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আমি নামব কৃষ্ণনগর স্টেশনে। আপনারা কোথায় উঠতে চান।

—কোনো দোকানে—চটিতে ; পরে বাসা দেখে নেব।

—চলুন। সেখানে আমার এক বন্ধুর বাসায় রাতটা আপনাদের রাখতে পারি। পরদিন দেখে শুনে অনায়াসে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব। স্থানটা আমার বিশেষ পরিচিত। ছয় বৎসর আমি ঐখানকার কলেজে পড়েছি।

—কারো বাসায় ওঠবার ইচ্ছা আদৌ নাই। দোকান দেখিয়ে

দেবেন, সেখানেই রাতটা কাটাব। পরদিন বাসা খুঁজে নেবার ভার আমার নিজের। লোক-সংসর্গে থাকতে আমি নারাজ।

—বেশ, তাই হবে।

সারারাত জেগে মা-মেয়েতে তুটি ট্রাঙ্ক একটি হাত বাক্স গুছিয়ে পয়ামাসিকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন চৌধুরী বাবুর সঙ্গে, ভোরের শুকতারা সবে দেখা দিয়েছে তখন। পাড়ার কেউ জানল না—কখন গেলেন, কেন গেলেন।

সকালে উঠে সবাই দেখে দোকানখানা বন্ধ। বড়ো একটা বন্ধ তালা ঝুলছে সদর দরজার কড়ায়।

রাত্রি নয়টায় কৃষ্ণনগর স্টেশনে ট্রেন পৌছল। স্টেশনের ধারে একখানি ছোটো বাড়ি, সামনে লেখা, "ভাড়া দেওয়া যাইবে।"

চেনা চৌকিদারকে ডেকে চৌধুরী বললেন, বাড়িটা ভাড়া নেব, চাবি খুলে দাও।

চৌধুরীকে চেনে চৌকিদার খুব। তৎক্ষণাৎ বাড়ি খুলে কুলীর মাথায় মালপত্র সমেত যাত্রীকয়জনকে বাড়ি ঢোকাল। পাশের বাড়ি থেকে জ্বালানো লণ্ঠন একটা এনে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

স্বতন্ত্র একখানি বাড়ি পেয়ে মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জলস্পর্শ না করে পয়ামাসিকে নিয়ে একঘরে তিনজনে শুয়ে পড়লেন। চৌধুরী গেলেন নিজের বাসায়।

পরদিন ঘণ্টা তুইয়ের মধ্যে ব্যবস্থা হয়ে গেল বেশ। যেখানে পয়ামাসি সেখানে অভাব অসুবিধা থাকতে পারে না বেশিক্ষণ।

চৌধুরী খবর নিতে এসে দেখলেন, এঁরা গুছিয়ে বসেছেন দিব্যি। কারো সাহায্য দরকার করে না।

মনে মনে মাকে প্রশংসা না করে পারলেন না। আত্মনির্ভর-পরায়ণা নারী বটেন ইনি।

চৌধুরীর প্রতি মায়ের মমতা তাঁর মনকে স্নেহে জড়িয়ে ফেলেছে অনেকখানি। অন্তরে একটা অজানা আনন্দ জাগে এঁদের সংসর্গে। শিবরানীর সঙ্গে কথা বলেন না তিনি কোনো দিন; কেমন যেন বাধে। ছ'মাইল দূরে চৌধুরীর নিজের বাড়ি। বৃদ্ধা মা থাকেন গ্রামের বাড়িতে, বিদেশ যাওয়ার আগে তাঁকে দেখে যেতে হবে। আজই বাড়ি যাওয়া চাই, সময় কম। শিবরানীর মা চৌধুরীকে গোপনে বললেন,—সেদিন বলতে যাওয়া কথাটা চাপা পড়ে গেছে। আপনার গ্রামান্তরে যাওয়া, ফিরে আসা—কেটে গেছে একপক্ষ। আমাদের প্রচ্ছন্ন জীবনকথা জানাতে চাই আপনাকে। কত বড়ো বংশ আমাদের বলামাত্র বুঝবেন। আমার স্বর্গীয় শ্বশুরের নাম না জানে কে। তাঁর একমাত্র ছেলে শিবরানীর বাবা হাইকোর্টের উকিল। দশখানা পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়। ভাড়া উঠত মাসে দুহাজার, ব্যাঙ্কে জমা ছিল কয়েক লক্ষ টাকা, নিঃশেষ হয়ে গেল সব অল্প কয়েক বৎসরে—ঘোড়দৌড়ে, জুয়ার নেশায়। দলের লোক জড়িয়ে ফেললে নানান ফ্যাসাদে, শেষে সর্বস্বান্ত একদিনে। জেলের ভয়ে পালাতে হোলো রাতারাতি। বলে গেলেন অজানা গ্রামে নাম লুকিয়ে থাকো গিয়ে—ভরসা রাখো নিজের উপর। দেখি কতদিনে কী উপায়ে ফিরতে পারি। সে আজ বারো বৎসরের কথা। একযুগ, আর কত অপেক্ষা করা যায়! শিবরানীকে কারো হাতে সঁপে দিয়ে প্রয়াগীকে সঙ্গে নিয়ে আমি দেশান্তরে চলে যাব সংকল্প করেছি। ওকে নিয়ে তো পথে চলাফেরা করা চলে না।

সুবরেণ্য থেমে থেকে বললেন,—দিতে পারেন আমার হাতে যদি চান। আমি নিজের মতে চলি, বলি, কাজ করি, যা ভাবি ঠিক তা থেকে কেউ আমাকে নড়াতে পারে না একচুল। মা আছেন, তিনি একান্ত সন্তানবৎসলা। আমার সুখে সুখী হওয়া তাঁর স্বভাব। যেতে হবে বোম্বাই—সাত দিন বাকি। আজই রাত্রে বিবাহ করে আমাকে

তাহলে যেতে হয় মায়ের কাছে। মুখাপেক্ষা করার আমার কেউ নাই।

—আমার কে আছে আমি ছাড়া।

যে কথা সেই কাজ। রাত্রে বিবাহ করে স্ববরেণ্য চললেন বৌ নিয়ে নিজের গ্রামে মায়ের কাছে।

পয়ামাসি, শিবরানীর মা রইলেন ভাড়াটে বাড়িখানিতে শূন্য মন নিয়ে।

দশ

বৌরানীর বড়ো জ্বর। সেদিন বাড়ি ফিরে বিছানায় পড়ে প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকতে লাগলেন। ভোরের সময় তার করলেন দেওয়ানজি রাজাবাবুকে "বৌরানীর জ্বর বিকার—শীঘ্র আসুন।"

তার পেয়ে রূপেন্দ্রনারায়ণের বুকটা কেঁপে উঠল যেন বৌরানী সব জানতে পেরেছেন ভেবে। বড়োদরের নার্স নিয়ে রওনা হলেন তৎক্ষণাৎ। বৃথা ভাবনার সময় নাই এতটুকু, বাড়ি পৌঁছলেন বেলা দু'টোয়, স্নানাহার হয় নাই, মাত্র সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন। পৌঁছেই ছুটে চললেন বৌরানীর ঘরের দিকে। অচেতন বৌরানী জ্বরের ঘোরে, গিন্নিমা ব'সে সামনে, পুরানো ঝি চণ্ডী পায়ের কাছে ব'সে হাত বুলাচ্ছে পা দু'খানিতে। ডাক্তার এসেছিলেন সকালে বলে গেছেন জ্বরটা বাঁকা, বিকার সঙ্গে নিয়ে দেখা দিয়েছে—তিন চার দিন না কাটলে ধরা যাবে না কী ধাতের জ্বর। রাজাবাবুর সঙ্গে ফল এসেছে একঝুড়ি—বেদানা, কমলা, কেশুর, আঙ্গুর, রোগীর খাওয়ার জন্য। আইসব্যাগ মন খানেক বরফ সঙ্গে আনতে ভোলেন নি। বিলাতে শেখা পাকা নার্স দুয়েকটি দরকারি ওষুধও এনেছে নিজের সঙ্গে। রাজাবাবুর বুকে ভয়, কী জানি কী হয়। তাঁর পাপের ফল বা ফলে মুহূর্তে।

চিকিৎসা চলল, সাতদিনে জানা গেল জ্বর টাইফয়েড, ভারি গোছের। বড়ো ডাক্তার আনা হোলো শহর থেকে যাতায়াতে দৈনিক দুশোটাকা ফি; সঙ্গে এল নূতন নার্স পালা করে শুশ্রূষা করবে ব'লে। রাজাবাবু বৌরানীর কাছে বসে থাকেন দিনরাত, পুষু শোয় ঠাকুমার কাছে, মাকে দেখে যায় দিনে একবার ঝিয়ের সঙ্গে এসে। গিন্নিমা

পূজা মানছেন কত ঠাকুরের, মানসিক রাখছেন কালীঘাটের কালী ও বাবা বিশ্বেশ্বরের নামে, স্বস্ত্যয়ন হোম হচ্ছে প্রতিদিন বাড়িতে; বৌরানী বাঁচলে হয়। দেড়মাস হয়ে গেল জ্বরের বিরাম নাই ডাক্তার বলছেন জ্বরের জোর কমেছে বিকার কেটে আসছে, দুর্বলতায় মারা না পড়েন তো বাঁচতেও পারেন। বিকারের ঝোঁকটা কেটে একটু যেন জ্ঞান ফিরেছে, লোক চিনছেন অল্প স্বল্প। রূপেন্দ্রনারায়ণকে চোখের সামনে রাখতে চান সারাক্ষণ দেখতে চান বারংবার। একটু সরলে অস্থির হন। তিন-মাসে জ্বর ছাড়ল প্রথম, ডাক্তার বললেন ঠাঁইনাড়া করা ভালো গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে চলুন। বল যেটুকু আছে তাতে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ ঘটবে না মোটরে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা বৈ তো নয়, নার্স ডাক্তার সঙ্গে থাকবে।

মঞ্জুমালিকার বাপমায়ের কাছে নিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হোলো। শ্বশুরের ছোটো বাড়ি এখন আর রাজাজামাই যাওয়ার বাধা হোলো না। সেখানে গেলে খরচও হবে কম রোগী যত্নও পাবে যথেষ্ট। টাকার ভাবনা রাজাবাবু এখন ভাবতে শিখেছেন। বৌরানীর ব্যায়রাম তাঁর খামখেয়ালি মনে আক্কেল এনে দিয়েছে অনেকখানি। শ্বশুরকে লিখে সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন। পনর দিনে সাবধানে বৌরানীকে নিয়ে গিয়ে ফেললেন বাপের বাড়িতে। বাবা মাকে কাছে পেয়ে মঞ্জুর আনন্দ দেখে কে। মায়ের হাতের রান্না পথ্য পেয়ে ও বাবার মুখ দেখে সে বল পেতে লাগল দিনে দিনে।

রূপেন্দ্রনারায়ণ সঙ্গে থাকেন সর্বদা। বর্ষা শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কাশী যাবার ব্যবস্থা হোলো। হাওয়া বদলে সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন তাঁদের মত।

সেখানে গঙ্গার উপর বড়ো বাগানবাড়ি ভাড়া নিলেন রূপেন্দ্রনারায়ণ বৌরানীর জন্য, মা, পুষুকে আনলেন সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাবা

বিশ্বেশ্বরের মানসিক শোধের কথা মায়ের মনে জাগছিল সারাক্ষণ। সুযোগ পেয়ে এবার তিনি এ যাত্রায় বিশ্বেশ্বর দর্শন, বহু তীর্থ ভ্রমণ সারবেন সংকল্প ক'রে বেরুলেন—মানসিক শোধের সংকল্প তো আছেই।

দিন দেখে সপরিবারে রূপেন্দ্রনারায়ণ রওনা হলেন কাশী, সঙ্গে বিপদ-পারের কাণ্ডারী বৃদ্ধ দেওয়ানজি।

এগারো

দুপুর রোদে গ্রামের পথে গরুর গাড়ি চড়ে সুবরেণ্য বউ নিয়ে চলেছেন বাড়ির দিকে। বাপের ভিটায় গিয়ে পৌছতে সন্ধ্যা হবে ; গাড়ির ভিতরে বসে শিবরানী। সঙ্গে একটি ছোটো টিনের ট্রাঙ্কে শিবরানীর থানকয়েক কাপড়। পাশে একটা চামড়ার স্যুটকেশ রেখে সামনে বসেছেন সুবরেণ্য। গাড়োয়ান গাড়ি চালাচ্ছে ঢিমে চালে, পথ ফুরোয় না।

শিবরানীর মুখখানি শুকনো, চোখ দুটি জলভারাক্রান্ত, মাকে ছেড়ে এসেছে এ বেদনা তার বুকে সম্পূর্ণ নূতন।

বেদনাভরা হৃদয়ে একটি অনির্বচনীয় আনন্দ জেগেছে যার অনুভূতিও তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। মনটাকে তার ভোলাবার জন্যে সুবরেণ্য নিজের মায়ের কথা, গ্রামের কথা, পুরাতন ভিটাখানির পুরাতন স্মৃতিগুলির কথা নানাভাবে পাড়লেন তার কাছে।

দিনশেষের সঙ্গে রানীর বিক্ষিপ্ত মনটি ভরে আসতে লাগল একটি মাধুর্যভরা সুষমায়। সুবরেণ্যের স্নেহের স্পর্শ নিবিড় হয়ে এল তার মনের মধ্যে। অজানা আবেগে নিজের হাতখানি ধীরে ধীরে রাখল সে স্বামীর হাতের উপরে একান্ত নির্ভরে।

সদর দুয়ারে গাড়ি পৌছাল। আকাশে চাঁদ তারার আলোক ফুটেছে তখন সবে। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন সুবরেণ্য ঝাঁপিয়ে— মাকে দেখবার জন্য কত না ব্যস্ত তখন মন।

সন্ধ্যার আগেই মা দুয়ার বন্ধ দেন, শেয়াল কুকুর ঢোকার ভয়,

চোরের ভয়ও যে নাই তাও নয়। জোরে জোরে কড়া নাড়ছেন ও মাকে ডাকছেন জোর গলায় স্ুবরেণ্য—মা মা, দরজা খোলো।

প্রদীপ জ্বালিয়ে মা তখন সবে সন্ধ্যায় বসেছেন। ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন আহ্নিক ছেড়ে। ব্যস্ত হয়ে দুয়ার খুলে বললেন—কে রে। আমার বরু নাকি। তুই যে এলি খবর না দিয়ে—আয় বাবা আয়—ঘরে আয়।

—গাড়িতে তোমার বউ বসে মা, নামিয়ে আনো।

—বউ, আমার বউ ?

—হাঁ, মা, আমি বিয়ে করে তোমার বউ নিয়ে এসেছি। ঘরে তোলো নিজের বউ।

কথা কওয়ার সময় নাই। ছুটে গেলেন মা গাড়ির দিকে। হাত ধরে নামিয়ে নিলেন গাড়ি থেকে শিবরানীকে।

—মা লক্ষ্মী, নিজের ঘরে এসো, তুমি আমার বরুর বৌ, এ বাড়ি এ ঘর তোমার—মা।

শিবরানী ঘোমটা দিয়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলে মায়ের পায়ে—মনে পড়ল নিজের মায়ের পা দুখানি। কোথায় ফেলে এসেছে মাকে তার আজ—কে জানে।

বৌকে উঠানে দাঁড় করিয়ে পুরানো বাক্স খুলে একখানি সেকেলে সোনার পদক বের করে এনে মা বৌএর গলায় দিলেন ঝুলিয়ে। বাতাসা ভেঙে মুখে ধরলেন তার বড়ো আদরে।

—যত আদর সব কেড়ে নিল তোমার বউ—আমি ফাঁকি পড়ব বুঝি। আমার বুঝি খিদে তৃষ্ণা নাই। চারখানা বাতাসা দাও আমাকে আগে।

মাদুর পেতে বউ বসিয়ে মা আনলেন খানকতক বাতাসা—সদ্য কোটা সরু চিড়ে।

—এই নে বরু—জল খা। এইবার আমি তোদের খাবার জোগাড় করি। অনেক পথ এসেছিস।

শিবরানী শ্রান্ত ; খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমে চোখ ভেরে এল সঙ্গে সঙ্গে। মা ছেলেতে দাওয়ায় বসে কথা হচ্ছে।

—বিয়ে করলি, কাউকে জানালি নি বরু, গ্রামের লোকে বলবে কী। ঘোঁট করবে—কার মেয়ে কোন জাতি, কোথা বিয়ে হোলো কে বিয়ে দিল—হাজার কথা তুলবে তারা, জানিস তো।

—ব্রাহ্মণের মেয়ে—বাপের নাম সুবিমল ভট্টচার্য কলকাতার বড়োলোক। পিতামহের নাম জানে সবাই। পুরোহিতে বিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ, অগ্নি, শালগ্রাম সাক্ষী। তোমার ছেলে সব করতে পারে। গ্রামের লোক ঠেকাবে সে এক কথায়—দেখে নিয়ো।

ছেলের কথায় মায়ের অগাধ বিশ্বাস। মা জানে বরু আমার যা বলে তাই করে। নিশ্চিন্ত মনে মা শুতে গেলেন।

সকালে উঠে জল খেয়ে সুবরেণ্য গেলেন গ্রামের মাথা মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি। বৈঠকখানায় বসে তিনি আলবোলায় তামাক টানছেন, ভারি চালে কথা কইছেন দু'চার জনের সঙ্গে।

প্রণাম করতেই বললেন তিনি,—কী বরু নাকি। কবে এলে। কাজকর্ম চলছে কেমন।

—ভালোই, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে বদলি করেছে। সাত দিনের মধ্যে যেতে হবে। আমার বিবাহ হয়েছে তাড়াতাড়িতে গ্রামের সকলকে খবর দিতে পারিনি। বউ নিয়ে এসেছি বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হব। বোম্বাইয়ে অনেকগুলি চাকরি খালি আছে ; আপনার ছোটো ছেলে ননী আই-এ পাশ করে বসে আছে, তার জন্য একটা কাজের চেষ্টা দেখব।

ছোটো থেকে সুবরেণ্য ননীগোপালকে ভালবাসে দু'জনের মন মেজাজ ধাতেও বেশ মিল।

—হাঁ বাবা তাই করো ; ছেলেদের নিয়ে পারা যায় না আজ কাল। ননকো' করে পড়া ছেড়ে আমাকে দ'য়ে ডুবিয়েছে দেখো না কতখানি। তুমি তার একটা গতি করে দাও তো বাঁচি। ও বেলা যাব বউমাকে দেখতে। বৌমার বাবার নামটি কী।

—সুবিমল ভট্টাচার্য—নামজাদা লোক কলকাতার।

পাশে-বসা রামতারণ বাড়ুজ্যে বললেন, শহরের হাওয়া এসে ঢুকে পড়েছে গ্রামে—গ্রাম বাঁচানো দায়।

ছোটো ছেলে ননীগোপাল কাছে ছিল, বলে উঠল, শহরের বিদ্যা বুদ্ধি গ্রামে এনে না ফেলে, এঁদো পুকুর না ঝালিয়ে, বনবাদাড় না ঝাড়িয়ে, মশামাছি না তাড়িয়ে ম্যালেরিয়ায় মরুক গ্রামের লোক। লোক মরলে গ্রাম বাঁচবে কাকে নিয়ে।

জবাব দিতে না পেরে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন—আর বাবা আজকাল গ্রাম শহরে মাখামাখি, তোরা যা বুঝিস তা কর্।

শহরের সুখ সুবিধা সব আমরা আনতে চাই গ্রামে, গ্রামের মানুষ গ্রামে থেকে।

কাজ হাসিল করে সুবরেণ্য বাড়ি ফিরলেন। মাকে বললেন, ভাত দাও মা শীগগির, ওবেলা মহিম চক্রবর্তী এসে তোমার বউএর হাতে ভাত খাবেন স্বীকার হয়েছেন।

পাঁচদিন গ্রাম ঘুরে, ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে, তাদের কাছে নূতন কাজের কথা ছড়িয়ে সুবরেণ্য বউ নিয়ে রওনা হলেন, মাকে বলে গেলেন আট মাস পরে ফিরব বোম্বাই থেকে। মাইনে বেড়েছে বেশি টাকা পাঠাব, চাকর রেখো একজন মজবুত দেখে।

পথে পয়ামাসি শিবরানীর মা সঙ্গ নিলেন ; কাশীতে নেমে থাকবেন

তাঁরা বছর খানেক। শিবরানীকে পাঠিয়ে দিয়ে মায়ের মন টেকে না বাড়িতে একটুও।

* * * *

আটমাস বোম্বাইয়ে কাজের মেয়াদ শেষ করে সুবরেণ্য বাড়ি ফিরছেন। পথে নামলেন শিবরানীর মায়ের খোঁজ নিতে—দেখা করতে। তাঁরা থেকে যাবেন কাশীতে সুবরেণ্যকে ফিরতে হবে কর্মস্থলে কলকাতায়। ননীগোপালের কাজ করে দিতে ভোলেন নি তিনি বোম্বাইয়ে।

কাশীতে আছেন তাঁরা তিনদিন।

বিকালে বেড়িয়ে সুবরেণ্য বাসায় ফিরেছেন। শিবরানীর কাছে বসে বললেন, গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখলুম—তোমার রাজাবাবু ও বৌরানী বেড়াতে বেরিয়েছেন মোটরে।

—বৌরানী—এখানে কাশীতে? ব্যাকুল আগ্রহে বলল কেমন দেখলে তাঁকে।

—বেশ ভালো—মোটরে রাজাবাবুর পাশে বসে যাচ্ছেন, সঙ্গে খুকি রয়েছে।

—বৌরানীকে আমি দেখতে চাই কেমন করে দেখা পাব।

—বৌরানীকে দেখতে গেলে আগে রাজাবাবু দেখা দেবেন—সেটা জানো তো? ব'লে সুবরেণ্য একটু মুচকে হাসলেন।

হাসির দিকে দৃকপাত না করে শিবরানী বলল,—বৌরানীর পুণ্য-ফলে অভিশাপ আশীর্বাদ হয়ে গেছে আমার জীবনে।

—আর একটু হোলে তুমি তার সতীন হয়ে পড়েছিলে যে।

শিবরানীর বুক ফেটে কান্না ও চোখ ফেটে জল এল এ কথায়।
—অমন সর্বনাশের কথা মুখে এনো না। সাধ্বী বৌরানীর স্বামী কেড়ে নেয় এমন সাধ্য কার।

তোমার স্বামী যদি কেউ কেড়ে নেয় রানী ?

—বুকটা আমার পুড়ে ছাই হবে—খাঁ খাঁ করবে শূন্য শ্মশানখানা হাহাকারে ভরে। বুকটা যেন তার মুচড়ে ভাঙতে লাগল।

স্ুবরেণ্য বুঝলেন এ প্রসঙ্গে শিবরানী ঠাট্টা সইতে পারবে না এতটুকু। তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,—

—রাজাবাবুদের বাঁচবার মূলে দেওয়ানজির দরদ, আমাদের সৌভাগ্যের মূলে পয়ামাসির পয়—নয় কি রানী। এদের কোথায় ঠাঁই হবে বলো তো।

—ধ্রবলোকে—যেখানে মুহূর্তের স্খলন নাই।

দশমিকা নবমিকা

এক

গ্রামের ত্রিবেণী ঠাকুর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নদীর তীরে ঘর, ভোরে উঠে প্রতিদিন নদীতে অবগাহন স্নান ক'রে একগলা জলে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী জপ করেন একশো আট বার গুণে। জপ শেষে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের আলোকমূর্তি দর্শন ক'রে জোড় হাতে পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তীরে ওঠেন ধীর গতিতে। আট ও দশ বছরের দুটি মেয়ে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আসে বাপের শুকনো কাপড় গামছা হাতে নিয়ে। দুটিতে তারা ফুল তোলার চুবড়িও আনে। মাঠের কাছে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ, ঝরা ফুলে তার তলাটা ভরে থাকে ভোরের সময়। গোরু-বাছুর মাড়িয়ে যাবার ও ছেলের দল পায়ে দল্‌বার আগে ফুলগুলি তারা দুই বোনে কুড়িয়ে রাশ করে। আশেপাশে গন্ধরাজ, ভুঁইচাঁপা, হলুদবরন কল্‌কে ফুল ঝাড়ে ঝাড়ে ফুটে থাকে। অযত্নে জন্মানো এই গাছগুলো ফুল জোগায় পাড়ার মানুষদের কম নয়। খুকিরা ঐ সব গাছ থেকেও ফুল পেড়ে জড়ো করে অনেক। বাড়িতে বাবা-মা দুই-জনের পূজার ফুল চাই। তারাও মাটিতে পুকুর কেটে পুণ্যিপুকুর ব্রত করে বৈশাখ মাসে, মাটি দিয়ে শিব গড়ে পূজা করে বারো মাস। ফুল তোলা, পূজার ঘরে ফুল সাজানো মেয়ে দুটির নিত্য কাজ। বাড়িতে বিগ্রহ নাই—পূজার ঘরে একখানি গীতা থাকে একটি ছোটো সিংহাসনের উপর। দুয়ার বন্ধ দিয়ে ত্রিবেণী ঠাকুর পূজায় বসেন। শুধু ধ্যানস্থ থাকেন কী মন্ত্রাদি পড়ে গীতা গ্রন্থ পূজা করেন কেউ তা দেখতে পায় না কোনো দিন। মা, স্বামীর পায়ের পুরানো খড়ম দুটি চন্দন মাখিয়ে আর

একটি সিংহাসনে রাখেন, প্রতিদিন তাতেই ফুল চড়ান। ফুটন্ত জোড়া পদ্মের মতো মেয়ে দুটি ফুটে থাকে ঘরের বুকে। ঠাকুর-ঠাকুরানি অচল নিষ্ঠায় দিন কাটান পরিবারটিকে পবিত্রতায় অটুট রেখে।

স্নান, জপ সেরে ঘাটে উঠে গামছায় গা মাথা মুছে শুকনো কাপড় পরে, ভিজে গামছা-কাপড় নিংড়ে ঠাকুর ডাকলেন, দশমী ধর্ তো ভিজে কাপড়খানা, নবমী করছে কী, সে আবার গেল কোথায়।

—পুলিনদের বাগানের বেড়ায় বড়ো বড়ো টগর ফুটেছে অনেকগুলো তাই পাড়তে গেছে। একটু দূরে, এখনই ফিরবে,—বলতে বলতে নবমী ছুটে আসছে দেখা গেল।

আয় তোরা আমার সঙ্গে, ব'লে ঠাকুর এগিয়ে চললেন ঘরের দিকে, মুখে গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে।

মেয়ে দুইটির নাম দশমিকা, নবমিকা দু'বছরের ছোটোবড়ো। বড়োটি দুর্গাপূজার দশমীতে ও ছোটোটি দুই বৎসর পরে, পূজার নবমী তিথিতে জন্মেছে, সেই সূত্রে এই নামকরণ। বাপের নাম শ্রীত্রিবেণীশ্বর পাঠক। জ্ঞানী পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি আছে গ্রামে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। দূর গ্রাম, শহর থেকে লোকে কোষ্ঠি করাতে ও ফলাফল শোনাতে তাঁর কাছে আসে সব সময়। বেলা ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত তিনি এই কাজ করেন। বারোটার সময় উঠে আতপান্ন আহার ক'রে ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর তিনটা পর্যন্ত উঁচুদরের গ্রন্থ পাঠ করেন নিবিষ্ট মনে।

আধুনিক কালের অনেকগুলি শিক্ষিত ছেলে জ্যোতিষ-বিজ্ঞান শেখবার জন্য গ্রামে এসে বাসা বেঁধে বাস করে তাঁর বাড়িতে মাসেক দু'মাস। বছরে দু'তিন দফায় এসে তারা বিজ্ঞানটি আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে, বোঝে—ব্যাপারটা বড়ো সহজ নয়; অধ্যবসায়, মনোযোগ চাই খুব বেশি তবে যদি কিছুটা আয়ত্ত হয়। কেউ তারা কলেজের পোড়ো ছেলে—কেউ

চাকুরে। ছুটির ফাঁকে আসাই তাদের সম্ভব হয়। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে বেশির ভাগ প'ড়োরদল ও পূজার ছুটিতে বেশির ভাগ চাকুরে বাবুরা এসে থাকে। গ্রীষ্মে গ্রামের আম-কাঁঠাল জাম-জামরুল, কচি তালের শাঁস, নেয়াপাতি ডাবের জল প্রভৃতি উপাদেয় রসাল ফলগুলি প্রচুর পরিমাণে খেয়ে তারা তৃপ্ত হয়। শহরের দারুণ উত্তাপ থেকেও গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুখ পায় অনেকখানি।

ত্রিবেণী ঠাকুর শিক্ষা দিয়ে পয়সা নেন না কারো কাছে। শিষ্যেরা জোড়া জোড়া কাপড় আনে মাঠাকুরানি ও খুকিদের জন্য,—ঠাকুরের জন্য ছাতা, খড়ম, বসবার আসন. পাটের জোড় এনে থাকে ভক্তি ক'রে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ও কার্তিক মাসে রাসের সময় ত্রিবেণী ঠাকুরের বাড়িতে উৎসবের ঘটা লাগে। গ্রামের ইতরভদ্র সকলকে তিনি ভোজনে পরিতৃপ্ত করে আনন্দ পান। রান্না করেন পাড়ার মেয়েরা ও গৃহিণী স্বয়ং। গৃহিণীর নাম শ্রীমণ্ডিতা দেবী। যে কাজে তিনি হাত দেন সব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে—বাপ-মা নাম রেখেছিলেন সার্থক। গ্রাম জুড়ে তাঁর নামডাক—রান্নার খ্যাতি।

গ্রামের খাওয়া মাছ, ভাত, তরকারি পায়স। লুচির কারবার দেখা যায় না সেখানে। শহুরে শিষ্যেরা আজ ক' বছর থেকে ক্যানেস্তারা ভরা ঘি ও থলে বোঝাই ময়দা আনে উৎসবের সময়। রাতের ভোজে লুচি খাওয়ানো চলছে আজ কয়েক বৎসর। মেয়েরা অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধনে ও পরিবেশনে পটু—লুচির কাজের ভার নেন পুরুষেরা।

ত্রিবেণী ঠাকুরের ঘরে অন্নের অভাব নেই, পাঁচশো বিঘে লাখরাজ জমিতে ধান হয় প্রচুর। বাস্তুভিটেখানি নিষ্কর, দানসত্বে পূর্বপুরুষের পাওয়া—খাজনা লাগে না এক পয়সা। আম কাঁঠালের বড়ো বাগান বাড়ির সঙ্গে লাগাও ; খেয়ে ফুরোতে পারে না নিজেরা ও শিষ্যেরা।

দুই

রাসপূর্ণিমা—উৎসবের দিন ভোরে উঠে গৃহিণী খুকিদের বললেন, যা, তোর পদ্ম পিসিকে ডেকে আন্‌গে। উঠান জুড়ে আলপনা দিতে হবে। নক্‌শাচিত্রে পারদর্শিনী পদ্মপিসি গ্রামের মেয়ে, শ্বশুর ঘরের মুখ দেখেনি কখনো। বাপের একমাত্র মেয়ে বিবাহ দিয়ে জামাই ঘরে রেখে মানুষ করেছেন; মৃত্যুকালে বিষয়-সম্পত্তি মেয়েজামায়ের হাতে সঁপে বাপ স্বর্গলাভ করেছেন সম্প্রতি। জামাই শ্বশুরের যজমান কয়ঘর বজায় রেখে পূজাপার্বণ ক্রিয়াকর্মে যা দুপয়সা রোজগার করেন তাতেই স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়। পদ্ম নিঃসন্তান বয়স আন্দাজ ত্রিশ। তার স্বাস্থ্যনিটোল দেহখানি ও উৎসাহভরা মুখখানির দিকে তাকালে মনটা খুশি হয়ে ওঠে খুব। পাড়ার সমবয়সীরা ছোটো থেকে তাই পদ্মকে ডেকে থাকে পাড়াজাগানি পদ্ম ব'লে।—তোরা ঘুমিয়ে মরবি সারাক্ষণ, ঘুমভাঙানি পদ্ম নইলে জাগাবে তোদের কে—ব'লে নিজেদের মধ্যে ভালবাসাটা পদ্ম জমিয়ে তোলে আরো বেশি ক'রে। মেয়েমহলে পদ্মর খাতির খুব। সবার ঘরে তার ডাক।

ভোরের সময় স্নান সেরে একরাশ কালো চুল পিঠে ছড়িয়ে, নিজের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে, পদ্ম ভিজে কাপড়খানা টাঙানো দড়ির উপর মেলে দিচ্ছে, এমন সময় দশমী, নবমী বোনতু'টি এল ডাকতে। পূর্ণিমা তিথি, স্বামী যাবেন যজমান বাড়ি তিথি-পূজায়। তাঁর খড়ম, গামছা, ধুতি, উড়ুনি গুছিয়ে রেখেছে রাতেই পদ্ম। সেগুলি সামনে এগিয়ে দিয়ে ঝি গোবরার মাকে বাড়িঘর দেখতে ব'লে চলল পদ্ম খুকি তু'টির সঙ্গে পাঠক ঠাকুরের বাড়ি। বাড়িতে আজ রান্নার পাট নেই, স্বামীর খাওয়া যজমান বাড়ি, পদ্মর নেমন্তন্ন পাঠক বাড়িতে।

কপালে বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথেয় চওড়া সিঁদুর, চুলের ডগায় গেরো বেঁধে ছড়ানো চুলগুলো কায়দায় এনে পাঠকদের বাড়ির উঠোনে বসে পিটুলি গোলা গামলা নিয়ে পদ্ম আলপনা দিচ্ছে নিবিষ্টমনে। খুকি দু'জন উবুড় হয়ে ঝুঁকে পদ্মর হাত ঘোরানোর কায়দা দেখছে অবাক হয়ে। সারে সারে নকশা ফুটে উঠছে রকমারি নমুনার।

উঠানের ধার ঘেঁসে চারিপাশে আগে পড়ল শঙ্খলতার পাড়, কোণে কোণে কল্কেফুলের কল্কা, সন্ধ্যামণির ঝাড়, ফাঁকের গায়ে বেঁকে উঠছে বোঁটা সমেত পাপড়ি মেলা ফোটা পদ্ম। পরের সারে জোড়া জোড়া লক্ষ্মীপ্যাঁচা, শঙ্খচিল ও হাঁসের দল। উঁচু সারে সরু করে ঝুমকো লতার বেড়। শেষে ধানের শিষের শয্যা পেতে নূতন ধানের আগমনীর আভাস জানিয়ে বসল একটি মরাই—আলপনাতে শ্রীফুটল অপূর্ব।

পিটুলি গোলা গামলা হাতে উঠে দাঁড়াল পদ্ম, দশমী নবমী দৌড়ে এসে ধরল তাকে—আমাদের একটু শেখাও না পদ্ম পিসি—কেমন ক'রে আঙুলের টান দেব ব'লে দাও না।

—ওপাশের দাওয়ায় গিয়ে গোলা নিয়ে বোস্, আমি দিচ্ছি তোদের দেখিয়ে। আগে ডোরা টান্ গে।

মনটা খুকিদের জলজলে। না-জেনে শিখে ফেলেছে তারা অনেকখানি। পদ্ম আসার আগেই তারা ফুল, পাতা, লতা, পাখি এঁকে ফেলল, পদ্ম দেখে অবাক।

সন্ধ্যায় রাস। প্রতিমা-প্রতীক নাই পাঠকের বাড়ি। চিত্র করা ঘট এনে বসানো হোলো; ঘটের গলায় গন্ধে ভরা গন্ধরাজের গোড়ে মালা। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, শাঁকের ধ্বনি ঘোরাল ক'রে তুলল সন্ধ্যাটাকে। ভরিয়ে তুলল সবার মন ভাবের ভারে। তিথি-পূজা করলেন ঠাকুর সুনক্ষত্রের সুদৃষ্টিতে ভর করে।

তিন

ছয় বৎসর কেটে গেছে। ত্রিবেণী ঠাকুরের গ্রামখানিতে পরিবর্তন ঘটেছে ঢের—আরো ঘটছে দিনে দিনে। নূতন শিক্ষার হাওয়া বইতে শুরু করেছে দশের জ্ঞানে, মানুষের মনে। পৃথিবীর খবর এনে দিচ্ছে খবরের কাগজগুলি ; পড়ে মানুষ চম্‌কে উঠছে নূতন চেতনায়—বিস্মিত হচ্ছে বৃহৎ পৃথিবীর পরিচয় পেয়ে। গ্রামের, শহরে-পড়া ছেলের দল উঠে পড়ে লেগেছে গ্রামের উন্নতির কাজে। তিন বছরের গড়া গ্রামের মাইনর স্কুলটিকে তারা উচ্চ শিক্ষালয় না ক'রে ছাড়বে না। নিম্ন প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ও খোলা চাই যত শীঘ্র সম্ভব—তাদের ঝোঁক। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় মানে না তারা ঘুরে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে টাকা তুলতে মানুষ জড়ো করতে। জমিদার বাবুরা তাদের কাজে সায় দিচ্ছেন দায়ে পড়ে, নইলে পাতা পান না সবার কাজে সভার মাঝে। ছেলেদের উদ্যম অধ্যবসায় অসাধারণ। গ্রামের পাগলা পাঁচু গেয়ে বেড়ায় :—

"—বেঁচে থাকো সোনার ছেলে
কাজ করে যাও অবহেলে—"

ত্রিবেণী ঠাকুরের জ্যোতিষবিজ্ঞানের চর্চা চলছে সমভাবে। বরং শিষ্য সংখ্যা বেড়েছে। বাড়ির রীতিপদ্ধতি বেশি কিছু বদলায়নি ; তবে মেয়ে দুটি বড়ো হয়েছে তাই বাড়িতে বাসা পায় না কেউ ; যাতায়াত করে অনেকেই। মেয়েরা বড়ো হয়েছে বেশ, বিয়ে হয়নি আজো। পাড়ার লোকে বুঝতে পারে না জ্যোতিষী ঠাকুরের ভাবখানা। ভূতভবিষ্যৎ ভেবে থাকেন তিনি অন্যের তাঁর ভাবনা ভাববে কে। ঠাকুর রাশভারি মানুষ, সামনে কারো কথা বলতে সাহস হয় না।

দুপুর রাত ; ঠাকুর বিছানায় শুয়ে। শ্রীমণ্ডিতা দেবী বসে স্বামীর পদ-সেবা করছেন, ছোটো একখানি হাত পাখা হাতে নিয়ে বাতাস দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। পাশের ঘরে দশমী, নবমী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গৃহিণী বললেন, মেয়েদের ভাবনা ভেবে আমার চোখে ঘুম আসে না রাত্রে। দিন, ক্ষণ, লগ্ন গুণছ তুমি দিনরাত, ওদের অদৃষ্টচক্র কি তোমার চোখে পড়ে না। সে চক্রের গতি কোন্ দিকে, কেমনতরো, তার ফলাফলই বা কী। আমার মনে কিন্তু সুখ নাই এতটুকু। তোমার মনের সন্ধান পাই না এ সম্বন্ধে আমি কিছু মাত্র।

ঠাকুর বললেন, গৃহিণী, গোপন করেছি তোমার কাছে একটা কথা এতদিন। একটা বড়ো দারুণ খবর শোনাতে হবে তোমাকে, তাতে দুঃখ পাবে খুব। দশমিকার ভাগ্যে বড়ো দারুণ দাগা—বৈধব্য যোগ সুস্পষ্ট। জেনে-শুনে বাপ হয়ে বিয়ে দিই কী ব'লে। বিয়ের একটি মাসের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুযোগ সুনিশ্চিত। আমার গণনা অব্যর্থ।

ভয়ে গৃহিণীর মুখখানা শুকিয়ে উঠল, শোনামাত্র তিনি স্বামীর পায়ের গোড়ায় আছড়ে পড়লেন মূৰ্ছিতের মতো।

—ধৈর্য ধরো—বুদ্ধি স্থির রাখতে হবে বিপদে। আকাশের নক্ষত্রগুলি আমার পরম প্রিয় ; তাদের দিকে চেয়ে আমার রাত কাটে, তুমি জানো। অচল ধ্রুব নক্ষত্র আমার সাধনার ধন। তারই সঙ্গে গেঁথে দেব আমাদের আদরের ধন দশমীর ভাগ্য। বৈধব্যের হাত এড়িয়ে অরুন্ধতীর মতো স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে স্মরণাতীত কাল।—এক পক্ষ পরে রবিভুক্ত মেষরাশির কন্যা লগ্নে সুকর্মা যোগে দশমী ধ্রুব নক্ষত্রের গলায় মালা দেবে, স্থির করেছি। সেই রাতেই নবমীর বিয়ে দেব পরের লগ্নে শিক্ষিত সৎপাত্র পুষ্করনাথের সঙ্গে। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে অনেক-দিন। সকল কথা জানিয়েছি তাকে সবিস্তারে ; দশমীর ভাগ্যফল, নক্ষত্রবিবাহ সব সে জানে। পুষ্কর পিতৃমাতৃহীন, আমার ভিটায় বাস

করবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা রাখবে এতেই আমার সুখ। গ্রামের স্কুলের সে হেডমাস্টার, সবাই জানে তাকে, তোমার বাড়িতেও আসে সে প্রায় প্রতিদিন ; প্রিয়দর্শন মূর্তিটি তার দেখেছ তুমিও অনেকবার। বিয়ের দিন প্রতিবেশীদের জানাব কথাটা চেপে রাখতে হবে এখন।

দশমীর ভাগ্যদুর্যোগের খবরে অবসন্নপ্রাণ গৃহিণীকে নবমীর সৌভাগ্যের সুসংবাদ যেন একটু সান্ত্বনার প্রলেপ দিল। ভাঙাবুক বেঁধে উঠে বসলেন তিনি ; পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ে দুটির মুখ দেখে এলেন একবার প্রাণভরে। দশমীর দশা ভেবে মায়ের প্রাণ আবার যেন প্রবোধ মানে না। জ্যোতির্লোকে মন সঁপে দশমী দিন কাটাবে, এ কী এক নূতনতর কথা।

নিঃশব্দে আয়োজন চলতে লাগল; বিয়ের দিন পদ্মপিসির ডাক পড়ল ; মালা গাঁথা, শাঁখা-শাড়ির সাজসজ্জা সকলি নীরবে জোগাড় হোতে লাগল—আড়ম্বর আতিশয্য নাই কোনোখানে একটুও।

কচি প্রাণ মেয়ে দুটি বাবাকে ভালবাসে সমস্ত প্রাণ ঢেলে। তারা যেন বাবার চোখে চোখ পায়, বাবার কানে শোনে বাবার মনে মন মিশিয়ে চলে, বলে, খায়, শোয়। বাবা তাদের শিখিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা সুন্দর ক'রে। মিষ্টিগলায় স্তোত্র আওড়ায় তারা, মন মুগ্ধ করে যে শোনে তার। রাতে বিয়ে ; বর দেখেনি দুজনের একজনও। কে জানে তাদের কেমন বর আসছে আজ শুভক্ষণে।

বয়স দশমীর ষোলো কিন্তু মনে দশমী যেন সেই দশ বছরের মেয়ে। মন্ত্র পড়ে বাবা বললেন—শুভ লগ্নে শুভদৃষ্টি করো মা, চিরদিনের পতির পানে। দশমী চোখ তুলে চেয়ে দেখল সম্মুখে জ্বলজ্বলে জ্যোতির্ময় আলোক রাশি। বাবা বললেন, এই তোমার বর মা, এরই গলায় মালা দাও। দশমী ভাবল—এই কি আমার বর। এই জ্যোতির্মণ্ডল, এই আলোকরাশি! বাপের পুনঃ পুনঃ মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনিতে তার মনটা

যেন সম্মোহিত হোতে লাগল। ক্রমে তার চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে আসতে লাগল সেই অপার্থিব আলোকরাশির মধ্যে। চিত্রিত পিঁড়ির উপরে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মতো। হাতের মালাখানি হাতেই রয়ে গেল গলায় পরানো হোলো না কারো।

পরের লগ্নে কখন নবমিকার বিয়ে হোলো কিছুই জানল না সে। পরদিন ভোরে উঠে ত্রিবেণী ঠাকুর গৃহিণীকে বললেন—সন্ধ্যার ট্রেন ধরে দশমীকে ও তোমাকে নিয়ে আমি কাশী রওনা হব, গুরুদেব আছেন সেখানে। ঘরবাড়ি রইল সব পুষ্করনাথ-নবমিকার হাতে।

—অষ্টমঙ্গলা হোলো না যে ; আজই যাবে ?

—হাঁ, আজই যাব, থাক্ অষ্টমঙ্গলা।

চার

কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বগুরু বেদান্তবাগীশ, জ্যোতিষরত্ন, শুদ্ধচেতা, তেজস্বী ব্রাহ্মণ। বয়স আশি বছরের উপর; নিয়ম নিষ্ঠা শরীরখানি অটুট রেখেছে আজও। দুবেলা গঙ্গা স্নানে যান প্রায় আধ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে—কোমর একটু বাঁকেনি, বুক একটু ঝোঁকেনি, খাড়া সোজা চলেন। পথের লোক প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো গায়ে মাখে, ভাবে, রোগের বালাই দূরে যাবে, এমনি অটুট স্বাস্থ্য পাবে স্পর্শ পেলে। তিনি নিজের মনে এগিয়ে চলেন, তারা পিছু থেকে বলে,—বিদ্যায় ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি, কলির বেদব্যাস, যোগবলে দেহখানার দীপ্তি দেখেছ? তাদের একটি কথাও তাঁর কানে পৌছায় না কোনোদিন।

যোগ শিখতে, জ্যোতিষ ব্যাকরণ, বেদান্ত পড়তে ছাত্র-শিষ্য আসে দলে দলে; সকলকে শিক্ষা দেন তিনি সমান আদরে, ভক্তিতে তারা লুটিয়ে পড়ে তাঁর কাছে। ছাত্র-শিষ্যরা তাঁকে পিতাঠাকুর, গুরুঠাকুর ব'লে ডাকে, পণ্ডিত সমাজ ডাকেন আচার্য নামে।

দুমহল বাড়ি, বাইরের মহলটি একতালা, ভিতর মহলের দোতালায় দুখানি ঘর। একখানিতে আচার্যের বিধবা বোন থাকেন অন্যটি বন্ধ থাকে আচার্য-গৃহিণী স্বর্গগত হওয়া পর্যন্ত।

তিনদিক ঘেরা, সামনে থামের সার, বার বাড়ির বড়ো দালান, মোটা পুরু কম্বল বিছিয়ে আচার্য বিশ্বগুরু বসে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন। দালানের মেঝেটি চকচকে বেলে পাথরে বাঁধানো। এমন পরিচ্ছন্ন যে ছাত্রদের আসন লাগে না বসতে। দেয়ালে কাঠের তাক-এ অসংখ্য

শাস্ত্র গ্রন্থ সাজানো। পড়ার পুঁথি খুঁজে পায় ছাত্রেরা যখন যা দরকার। পাঠ চলছে, শিষ্য সুবন্ধু এসে খবর দিল, ঠাকুর, বাংলা থেকে ত্রিবেণীশ্বর পাঠক এসে পৌছেছেন সপরিবারে এইমাত্র।

—ব্যবস্থা সব ঠিক আছে—মেয়েদের পাঠিয়ে দাও অন্দরে, ত্রিবেণীর স্নান বিশ্রামের ব্যবস্থা করো সদরের কোণের ঘরে।

দুইমাস পূর্বে ত্রিবেণী ঠাকুর গুরুঠাকুরকে লিখে জানিয়েছিলেন আসার খবর, বিশ্বনাথ দর্শন, গুরুদেব দর্শন পাঠকপরিবারের বড়ো প্রয়োজন এই সময়ে। মেয়েটার মনের একটা স্থিতি তো করাতে হবে। দুপুরে আহারের সময় গুরুদেবের দর্শন পেয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ ক'রে তাদের প্রাণটা স্বস্তিতে ভরে উঠল। মনে হোলো ঐখানে তাদের সকল সমস্যার সমাধান। গুরু শিষ্যে আহারে বসলেন পাশাপাশি। প্রসাদ পেয়ে ভোজন শুরু করলেন পাঠক ঠাকুর দুদিন অন্ন গ্রহণ না করার পর। দশমিকা ও পাঠকগৃহিণী বসবেন পরে। তাঁদের খাইয়ে তবে বিধবা বোনের খাওয়া। অন্নব্যঞ্জন সব তাঁরই হাতের তৈরি। দোতলার বন্ধ ঘরটি নবাগতা মা-মেয়ের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হোলো। ত্রিবেণী ঠাকুর থাকবেন সদরে।

ত্রিবেণী ঠাকুর দশমিকাকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন অনেকখানি। তাকে এখন বেদান্ত পড়ানো তাঁর ইচ্ছা। গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা জানালেন। সানন্দে আচার্য সম্মতি দিলেন তখনি। দশমিকার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—বিচারবুদ্ধিতে শান দিতে হবে অনেকখানি, শানের পাথরখানি সঙ্গে নিয়ে পড়তে বসো। আগাগোড়া শান দিদি, আগাগোড়া শান। শুরু করো পড়তে দেখবে তখন ব্যাপারখানা। মন-বুদ্ধি-চৈতন্যের স্থূল পর্দা খসিয়ে জড়ত্ব ঘুচিয়ে পাতলা হালকা সূক্ষ্ম ক'রে তুলতে হবে শানের গুণে, বুঝবে তবেই বেদান্ত, ডুববে তার স্তব্ধনিতল নিগূঢ় রসে,—ব'লে আচার্য আর একবার মৃদু হাসলেন।

দশমিকা স্থির দাঁড়িয়ে, মুখে কথা নাই। কথাগুলি তার মাথায় ঢুকল কিনা, মনে বসল কিনা বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে নিজের আঁচলের খুঁটটি তুলে গলায় জড়িয়ে নত মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে পিতামহ আচার্যের চরণে অন্তরের সমস্ত ভক্তিটুকু উজাড় করে সে নিবেদন ক'রে দিল উত্তরে।

পাঁচ

দিন যায়, আচার্য-আশ্রমের কাজ চলে পূর্ববৎ; ত্রিবেণী ঠাকুর শান্ত হয়ে মন ঢেলে দিয়েছেন জ্যোতিষ গণনায়। দশমিকা পাঠ নিচ্ছে প্রতিদিন আচার্যের কাছে। আচার্যের বিধবা বোন ও পাঠকগৃহিণী দু'জনে গুরুসেবা দেবসেবায় থাকেন নিযুক্ত, সন্ধ্যায় শিষ্যদের মুখে ভাগবত পাঠ শোনেন প্রতিদিন। পাঠক আজও অবসর পাননি দশমিকার ভাগ্যফল, নক্ষত্রবিবাহের কথা আচার্যকে জানাতে। আচার্যের মনে প্রশ্ন উঠে না কারো সম্বন্ধে কখনো। তাঁর ঝাপসা ধারণা, দশমিকা অবিবাহিতা। পাঠকের দুই মেয়ে, ঘরবাড়ি এসবের কোনো খবরই রাখেন না তিনি। কুমার জীবনে পাঠক কাশীতে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন, যোগ, জ্যোতিষ শিখতে শুরু করেন, শেষে জ্যোতিষের দিকেই ঝুঁকে পড়েন বেশি। দেশে ফিরে পাঠকঠাকুর বিবাহ ক'রে সংসারধর্ম পালন করেছেন এতদিন। প্রৌঢ়াবস্থায় আবার এসেছেন গুরুর আশ্রয়ে।

মহাবারুণী যোগ। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে অসম্ভব ভীড়। মেয়ে হারানো, ছেলে হারানো, গহনা চুরির পর্ব চলছে চারদিকে। যাত্রীদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব—ঘরে ঘরে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রাণের ভয়ে সবাই অস্থির, তবু পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যাঘাত না ঘটে। ভীড় ঠেলে ত্রিবেণীঠাকুর ভোরে—অন্ধকার থাকতে মেয়েদের গঙ্গায় স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। নিজে স্নান করলেন প্রাতঃ সন্ধ্যা দু'বেলা। রাতে পাঠক অসুস্থ হলেন। ভোরের সময় সাংঘাতিক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেল। দুচারবার ভেদবমির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের শেষসময় হোলো উপস্থিত। গুরুর চরণে মাথা রেখে, গৃহিণীকে দশমিকে তাঁর পায়ে সঁপে, জ্যোতিষ্ক লোক

ধ্যান করতে করতে ঠাকুর স্বর্গে গেলেন সকাল হোতেই। গুরু ভরসা, —পাঠকগৃহিণী, দশমিকা অসহায় হোলো না অভিভাবক অভাবে। অচল অটল আশ্রয় তাঁদের আচার্যদেব।

বিদেশে আসার সময় স্বামীর পুরানো খড়মজোড়া আনতে শ্রীমণ্ডিতা-দেবী ভোলেন নাই। আজো তাঁর শয়ন শিয়রে থাকে সেই খড়মজোড়াটি, আচার্যের ঠাকুর ঘরে শিষ্যের খড়ম রাখা চলে না ব'লে। আচার্যদেবের আদেশে পাঠক-গৃহিণী গৃহস্থালী ছেড়ে গীতায় মন দিয়েছেন ষোলো আনা। সিংহাসনসহ স্বামীর গীতাগ্রন্থখানিও তাঁদের সঙ্গে এসেছিল। স্বামীপূজ্য গীতাখানি শ্রীমণ্ডিতার কাছে আজ পরম পূজ্য। দশমিকা সংসারের কাজ করে আচার্যের বিধবা বোনের সঙ্গে। অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয় না তাতে তার এতটুকু। সকল দিকেই তার নিষ্ঠা সমান।

রাজ-পরিবারের ছেলে রাজশেখর আচার্যের শিষ্য হয়েছেন সম্প্রতি। দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন তাঁর উদ্দেশ্য। মস্তবড়ো ডিগ্রি আছে তাঁর এম্-এ, তাতে দর্শন শাস্ত্রের ক্ষুধা মেটে নাই, তাই আচার্যের শরণাগত। রোজ যাতায়াত করেন আচার্যবাড়ি, পাঠ নেন মনোযোগের সঙ্গে, ধনীর সন্তান, বিলাসী নন এতটুকু। অল্পদিনেই প্রিয় হয়ে উঠেছেন আচার্যের।

ছাত্রদের পাঠের সময় তিনি আসতে পারেন না, বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকেন, বিপুল জমিদারি, তার কাজ দেখতে হয় সারা সকাল। স্বতন্ত্র সময় দিতে হয় তাঁর পাঠের জন্য ; দশমিকার জন্য আবার অন্য সময় নির্দিষ্ট থাকে এতে আচার্যের পরিশ্রম হয় খুব। শিষ্যের শিক্ষার আগ্রহ তাঁকে বেঁধে রাখে শিক্ষাদানে।

দশমিকা এগিয়েছে অনেকদূর। সন্ধ্যায় সে পাঠ নিচ্ছে আচার্যের কাছে ; রাজশেখর এসে উপস্থিত হলেন প্রকাণ্ড এক দর্শনগ্রন্থ হাতে নিয়ে। গ্রন্থখানা নূতন প্রকাশিত হয়েছে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের দার্শনিক ভাব

একত্র ক'রে। গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষায় লেখা। আচার্যকে ভাষান্তরিত ক'রে বুঝিয়ে তিনি বুঝে নেবেন তাঁর সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে।

একটি কিশোরী আচার্যের কাছে বেদান্ত পড়ছে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। দু'একটি পাঠ শুনে শুনে তার ধারণার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন কিছুক্ষণ, ভাবলেন মেয়েদের এমন পরিষ্কার বুদ্ধি।

দশমিকা উঠে গেল বাড়ির ভিতর।

—বোসো রাজশেখর, মেয়েটি আমার প্রিয় শিষ্য স্বর্গীয় ত্রিবেণী পাঠকের। ত্রিবেণী চলে গেলেন মেয়েটির ভাবনা আমাকে ভাবতে রেখে। নিজের ভাবনার ভার দিয়েছি ভগবানে; এখন এর ভার দিই কাকে।

—কী করতে হবে ওঁর জন্য, কী চাই।

—পাত্র—পাত্র চাই।

—উনি কি অবিবাহিতা।

—তাই তো আমার ধারণা; বিবাহিতার লক্ষণ তো কিছু দেখি না।

—কী করতে চান এখন।

—ওর বিবাহ দিতে চাই; বৃদ্ধ আমি, ওকে বেদান্ত পড়াই, কোনো শিষ্যের উপর ভার দিতে তো পারি না—বয়প্রাপ্তা, আমাকেই দেখতে হয়। প্রখর বুদ্ধিশালিনী, একদিনে আয়ত্ত করে তিন দিনের পাঠ; এমন শিষ্য পাওয়া সৌভাগ্য। কিন্তু আমার শক্তি নাই আর বেশি পরিশ্রম করার। ছাত্রগুলিকে তো ছাড়তে পারি না, তাদের শিক্ষা শেষ ক'রে দিতে তো হবে।

—আমি কিছু করতে পারি এ সম্বন্ধে, অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে?

—বিবাহ করো; দশমিকাকে বিবাহ করো। সকলদিকে গুণবতী কন্যা।

রাজশেখর হেঁটমাথায় নীরব রইলেন—সংকল্প বিবাহ করবেন না কখনো।

—গতকাল বর্ষফল গণনার সময় দশমিকার বর্তমান বর্ষের ভাগ্যফল গণনা করেছি। গণনায় দুটি অক্ষর উঠল বি, বা এতে বর্তমানবর্ষে তার বিবাহ বোঝায়। স্বামীর স্থান গণনায় স্বামীর নামের গোড়ার ও শেষের দুটি অক্ষর দেখা দিল "র—র"। তোমার নামের সঙ্গে মিল রয়েছে দেখছ তো বাপ্‌জি। ভাগ্যযোগে এই কন্যা তোমার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যায় না।

রাজশেখর মনে মনে গুরুর উদ্দেশে বললেন,—অসংসারী মন আমার, সংসার-বাঁধনে বাঁধতে চাইছেন কেন আচার্যদেব।

মনের ভাবটি তার একমুহূর্তে আচার্য যেন পড়ে ফেললেন। বললেন, এরূপ কন্যার সংসর্গে বাঁধা না পড়ে বাঁধন কাটিয়ে উঠা যায়। তুমি নির্ভয়ে বিবাহ করো, উভয়ে একত্র চারিধাম, চতুর্দশ তীর্থ, একান্ন পীঠ দর্শন করো, "আমি"র গ্রন্থি খসে যাবে বৃহৎ বিশ্বের সংস্পর্শে। যজন যাজন, পঠন পাঠন বিশ্বের বিরাটরূপ দর্শন—সবগুলি মুক্তির সহায়।

আচার্যের কথা একটা বড়ো রকমের ধাক্কা দিল রাজ-শেখরের মনে। তবে কি বিবাহ বন্ধন নয়; বিবাহের মধ্যেও কি মুক্তির পথ পাওয়া যায়। নূতন কথা। প্রকাশ্যে বললেন—গুরু আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

—ভয় নাই, বাপ্‌জি, ভয় নাই; দশমিকার মধ্যে মুক্তি আছে। স্বচ্ছ চৈতন্য ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ।

আশ্চর্য জ্ঞান আচার্যদেব—চৈতন্য কি প্রত্যক্ষ করা যায়।

—চৈতন্য প্রত্যক্ষ হন অভ্যাসগুণে।

—কেমনতরো অভ্যাস।

—জ্যোতির্ময় আত্মার ধ্যান।

—কোন খানে।

—অন্তরে—নিজের নিগূঢ়তম সত্ত্বায়—বাহিরে বিশ্বালোকে, বিশ্বের অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বরূপে।

কথাগুলি অন্তরে প্রবেশ করে রাজশেখরকে অভিভূত করে ফেলল। গুরুদত্ত শক্তির প্রভাবে ক্ষণকালের জন্য সত্ত্বার অখণ্ড স্বরূপ ভেসে উঠল তার অন্তরের মধ্যে। সে এক অত্যাশ্চর্য অভূতপূর্ব অনুভূতি—অনির্বচনীয় রসাস্বাদন।

ছয়

রাত্রে শ্রীমণ্ডিতা দেবীকে ডেকে আচার্য বললেন, মা শ্রীমণ্ডিতা, দশমিকার বিবাহ স্থির।

ভয়ে, বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতো জড়িত কণ্ঠে শ্রীমণ্ডিতা উত্তর করলেন—বি-বা-হ, দ-শ-মিকার। সম্ভব নয় পিতাঠাকুর।

—কেন নয়।

—তার অদৃষ্টে অকাট্য বৈধব্য যোগ সুনির্দিষ্ট—তার পিতার গণনা।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থেকে আচার্য বললেন, যোগবল, পুণ্যকর্ম, ভগবৎকৃপা ভবিতব্যের দোষ খণ্ডন করে—শাস্ত্রের বচন। দুশ্চিন্তা দূর করো মা, ভগবানের শরণাপন্ন হও।

—স্বর্গীয় স্বামী নক্ষত্রের সঙ্গে দশমিকার বিবাহ দিয়ে গেছেন, পুনরায় বিবাহ সম্ভব কী করে।

—নক্ষত্রের সঙ্গে বিবাহ? ব্যাটার আশ্চর্য বুদ্ধি বটে।

আচার্যের দূরভেদী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধি সর্বত্র সকল সমস্যা সমাধানে সমর্থ।

—নক্ষত্র অশরীরী জ্যোতিঃ, শরীর গ্রহণ ক'রে দশমিকার হাতের মালাখানি নিতে পৃথিবীতে আসাটা তার অসম্ভব কিসে।

স্পন্দিত বুকে শ্রীমণ্ডিতা আচার্য আর কী বলেন শোনার অপেক্ষায় রইলেন।

—দশমিকাকে বোলো মা, রাজপুত্র রাজশেখর নক্ষত্রলোক থেকে নেমে এসেছেন তার পাণিগ্রহণের জন্য। বিবাহের সকল অনুষ্ঠান পূর্বেই

শেষ করা হয়েছে। মাল্যদান বাকি। কাল পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় দশমিকা রাজশেখরের গলায় মালা পরাবে ধ্রুবনক্ষত্রের সামনে।

—অখণ্ডনীয় বিধিলিপি খণ্ডিত হোলো গুরুকৃপায়।

—বলো মা ভগবৎকৃপায়।

চন্দ্রমণি

এক

চন্দ্রমণি নামটি শুনলে হঠাৎ মনে হয় যেন স্নিগ্ধ মধুর আলোর ছটা ছড়ানো উজ্জ্বল মণিটির মতো জলজলে একখানি মুখ মানুষের মনকে টেনে আনে, চোখকে ধরে রাখে নিজের দিকে দেখামাত্র। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি আশা করলে চলবে না।

গ্রামের মেয়ে চন্দ্রমণির গ্রামে জন্ম, গ্রামেই মানুষ হয়ে সে এত বড়োটি হয়েছে। গ্রাম্য ছাঁচে ঢালা মনটি তার গ্রাম ছেড়ে আর কিছু ভাবতে কখনো শেখেনি। গ্রামের বুকে ভেসে ওঠা তার জীবনটিতে একটু নূতনত্ব এসে পড়েছিল ঘটনা সূত্রে।

গ্রামের মাইনর স্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কাজ করেন চন্দ্রমণির বাবা গুরুপদ ভট্টাচার্য। মানুষটি সৎ; গ্রামের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। অবস্থায় দরিদ্র গৃহস্থ, বিঘে দশ ধেনো জমি ও পৈতৃক ভিটাখানি সম্বল। স্কুলে বেতন পান মাসে বারোটি টাকা তাতেই সংক্ষেপে সংসার চালান।

প্রায় দশ বছর হোলো তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, চন্দ্রমণি তখন মাত্র আট বছরের। সেই থেকে কষ্ট করে বাপ তাকে মানুষ করছেন। ঘরে দ্বিতীয় মানুষ না থাকায় ঐ বয়সেই চন্দ্রমণিকে সংসারের ছোটো খাটো অনেক কাজ করতে হোত। বাপের খাওয়ার ঠাঁই করা, জল গড়ানো, ঘর ঝাঁট, বিছানা তোলা, পাড়া কাজগুলি তাকেই নিয়মিত করতে হয়। সিদ্ধপোড়া যা হয় করে রান্নাটা বাপ নিজেই করে নিতেন,

ছোটো মেয়ে রাঁধতে গিয়ে পাছে আগুন ধরিয়ে বসে গায়ে, ভয় ছিল। দশটার মধ্যে খেয়ে পণ্ডিতকে যেতে হোত স্কুলে। চন্দ্রমণিকে রেখে যান কার কাছে। তাই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন তাকে। পড়ানোর সময় সেও বসে যেত ছাত্রদের দলে। পাঠগুলি তার মুখস্ত হয়ে উঠত শুনে শুনে, অক্ষরগুলি চিনত সে বোর্ডের লেখা দেখে। পড়ার দিকে ঝোঁক দেখে বাপ তাকে কিনে দিলেন প্রথমভাগ। তিন মাসে প্রথম ভাগ হয়ে গেল শেষ। একবছরে সে দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে ধরে ফেলল কথামালা ; বাপ তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে বিস্মিত হয়ে মনে মনে ভাবতেন—চন্দ্রটা মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হোত।

বারো বছর পর্যন্ত নির্বিবাদে চন্দ্রমণির লেখাপড়া এগিয়ে চলল ছেলেদের সঙ্গে। এর পরে আর গ্রামের ছেলেস্কুলে মেয়ের পড়া চলে না।

ঘরে থাকে চন্দ্রমণি—বাপ যান স্কুলে, পাশের বাড়ির বাঞ্ছারাম চাষার বৌ দিনের বেলাটা চন্দ্রমণিকে একটু আগলে থাকবে, বাপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

খাওয়া সেরে বাপ স্কুলে চলে গেলে বাপের পাতে তাড়াতাড়ি চাট্টি খেয়ে নিয়ে, ঘরে দুয়ার দিয়ে, উঁচু তাক-এ তোলা বাপের পুরানো বইগুলি নিয়ে সে পড়তে বসে যেত। বেলা ১টা নাগাদ বাঞ্ছারামের বৌ এসে খোঁজ নিয়ে যেত দিদিমণি করছে কী। পণ্ডিতের সাবেকি আমলের অনেকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করা ছিল—রামায়ণ মহাভারত নানারকম পুরাণ, গীতা তাই চন্দ্রমণি পড়ে যেত বুঝে না বুঝে। বারবার পড়ায় ঐ সকল গ্রন্থের কিছু কিছু ভাব বসে যেত তার ছোটো মনখানিতে।

সন্ধ্যার সময় বাপের কাছে বসে রামায়ণ মহাভারতের অনেক গল্প সে মুখে মুখে বাপকে শুনিয়ে যেত যেন বই পড়ে যাচ্ছে এমনি ভাবে।

চন্দ্রমণির সকল বিষয়ে এমন ব্যুৎপত্তি লাভের ক্ষমতা দেখে বাপ ভাবতেন, এমন গরিবের ঘরে এ মেয়ে জন্মাল কেন। বিয়ের ভাবনাও ভাবতেন বাপ খুব বেশি, কিন্তু তিনি নিরুপায়; অন্তত পাঁচ-ছশ টাকার কমে মেয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। পৈতৃক দেনা ছিল কিছু, অল্প করে শোধ দিতেও মাসে চার পাঁচ টাকা চলে যায়। বাকি টাকায় কোনো রকমে দুটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। ভিটাখানি জমিদার-সরকারে পঞ্চাশ টাকায় বাঁধা, আজ পর্যন্ত ছাড়াতে পারেন নি। যা করেন ভগবান, ভেবে তিনি এ দুর্ভাবনা থেকে সাময়িক ভাবে অব্যাহতি পেতেন।

চোদ্দো বছর বয়সে চন্দ্রমণিকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরল। এখন তার বয়স আঠারো—চার বছর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শরীর তার শীর্ণ, শ্যামবর্ণ রংটি কালি বর্ণ হয়ে গেছে। নানারকম পেটেণ্ট ওষুধ বাপ দু-চার শিশি খাইয়েছেন, জ্বর থেমেছে কিন্তু শরীর সারে নি। চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে বাপ আর বিবাহের কথা মনেও আনতে সাহস পান না। এ মেয়েকে বিয়ে করবে কে।

আঠারো বছরের মেয়ে নিয়ে গুরুপদ পণ্ডিত দিন কাটান। ভবিষ্যতের ভাবনা মনে এলে ভয় পাওয়া ছাড়া ভাবনার অবশিষ্ট আর কিছু থাকে না।

এই সময় পণ্ডিত একদিন নিজের শরীরে একটি শক্ত ব্যারামের সূত্রপাত অনুভব করলেন। ভালোরূপ চিকিৎসার আশা কোথায়! কয়েকদিন চিন্তা করে তিনি একটা বুদ্ধি ঠাওরালেন, ভাবলেন, আমি মরি বাঁচি, যা হয়, মেয়েটার একটা গতি তো করতেই হবে।

শরীরটা ক'দিনই খারাপ। রাত্রে পণ্ডিত শুয়েছেন, চন্দ্রা বিছানায় বসে বাপের পায়ে হাত বুলোচ্ছে। বাপ বললেন, দেখ্ চন্দ্রা, তোর তো বিয়ে দিতে পারলুম না—বয়সও হয়েছে, শরীরও আমার খারাপ হয়ে পড়েছে। তোর একটা গতি করতে চাই। খবরের কাগজে রোজই

পড়ি, কলকাতায় আজ কাল আশ্রম স্কুল হয়েছে যেখানে মেয়েদের শিখিয়ে মানুষ করে উপার্জনক্ষম করে তোলে। সেই রকম একটি স্কুল বোর্ডিংএ অথবা আশ্রমে তোকে ভরতি করে দিলে তুই বেশ শিখে উঠতে পারবি। নিজের নিজেই চালাতে পারবি। আমি মরে গেলে তোর আর তেমন ভাবনা থাকবে না। কিন্তু আমার তো টাকা নেই যে খরচ করে তোকে শেখাব। একটা কৌশল করতে হবে, তাতে একটা মিথ্যাচরণ ঘটবে, কিন্তু করা যায় কী। বিপন্ন হোলে লোকে চুরি ডাকাতি করে। এটা তার চেয়েও বেশি খারাপ হবে না অন্তত আমি আর কোনো পথ জানি না। বিধবা ব'লে চালাতে পারলে বিধবাশ্রমে ফ্রিতে রাখা যায়, তোকে বিধবা সাজতে হবে। আমি গিয়ে আমার বিধবা মেয়ে ব'লে তোকে সেখানে ভরতি করে দিয়ে আসব। ভয় পাসনি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এ ক'টা দিন কোনো রকমে চলে যাবে।

অনেক কান্নাকাটির পর শেষে চন্দ্রমণি রাজি হোলো বাপের কথায়। পাঁজিতে ভালো দিন দেখে একদিন বাপ মেয়েতে রওনা হোলো কলকাতার দিকে। গ্রাম ছেড়ে শহরের মাটিতে পা পড়েনি চন্দ্রার কোনোদিন। শহরে এসে রাস্তা ঘাট দোকান বাজারের বহর দেখে ফ্যালফেলিয়ে সে চেয়ে থাকে অবাক চোখে যা দেখে তার দিকে।

রেল থেকে নেমে প্রথমেই বাপ তাকে নিয়ে গেলেন গঙ্গার ঘাটে। বাপে মেয়েতে গঙ্গা নেয়ে ঘাটে উঠে চন্দ্রার হাতের মরা সোনার পিতলের মতো রং বালা তুগাছি খুলে থান পরিয়ে তাকে বিধবা সাজানো হোলো। আনন্দময়ীর তলায় বিশ্রাম করে জল খেয়ে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ঠিকানা খুঁজে বাপ মেয়েতে তুপুর নাগাদ বিধবাশ্রমের তুয়ারে গিয়ে হাজির হোলো।

তু'ঘণ্টা বসে থাকার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গেহোলো দেখা, অভিভাবকের

স্থলে নাম স্বাক্ষর করে বাপ মেয়েকে দিলেন ভরতি করে আশ্রমে। পড়ার সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে, থাকার ব্যবস্থাও সুপরিপাটি। চন্দ্রমণির এমনতরো সুব্যবস্থা বাপ মাথা খুঁড়েও কোনোখানে করে দিতে পারতেন না। ভগবানের দয়া, তবে বাপ মেয়ের মনে একটা ভার চেপে রইল, কাজটা করে।

দুই

বুকের একমাত্র বাঁধন চন্দ্রমণিকে ছেড়ে যেতে পণ্ডিতের বুকখানা যেন খালি হয়ে গেল—মেয়েটাকে যেন জন্মের মতো বিসর্জন দেওয়া হোলো। আর কি সে দেশে ফিরতে পারবে—সম্ভব তো নয়। এ চিন্তা বাপের মনে গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল। ছোটো একটি টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে খানকয়েক পুরোনো কাপড়, দুটো জামা, একখানা আধময়লা পুরোনো র‍্যাপার, একখানা গামছা রাখা ছিল ; বাপ কর্তৃপক্ষকে বললেন, আমার অবস্থা বড়ো খারাপ, সাবেক পেড়েকাপড়গুলো মেয়ের ফেলতে পারলুম না ; কিছুদিনের মতো এগুলো ঘরে পরা চলবে কি, একজোড়া নতুন থান কিনে দিয়েছি—মাসখানেক পরে আর একজোড়া কিনে পাঠাব। পণ্ডিতের কাতর ভাব দেখে কর্তৃপক্ষ বললেন, আচ্ছা, থাক্, আমরা না হয় কিছু কাপড় জুটিয়ে দেব—আশ্রমে নিয়ম নাই বিধবার পেড়ে কাপড় পরার, আপনি এজন্য বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না। মেয়েটি বড়ো রোগা দেখছি, কোনো অসুখ নাই তো ?

পণ্ডিত বললেন—না অন্য কোনো অসুখ নাই, ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগা হয়ে গেছে, জ্বর আসে না অনেকদিন, সঙ্গে দুশিশি ম্যালেরিয়ার ওষুদ দিয়েছি। আপনাদিকে ভোগাবে না। যদি বেশি অসুস্থ হয়, আমাকে লিখলে আমি এসে নিয়ে যাব।

কর্তৃপক্ষ শুনে আশ্বস্ত হলেন।

বেলা দুটোর ট্রেন ধরে গুরুপদ পণ্ডিত বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি পৌছে উঠানে দাঁড়িয়ে তাঁর মনটা খাঁ খাঁ করে উঠল—

চন্দ্রমণির মা তাকে চাঁদি বলে ডাকতেন, মনে হোলো, তার মা যেন ঘর থেকে চাঁদি-চাঁদি ব'লে ডাকছেন।

পণ্ডিতের সমস্ত শরীরটা ঘিরে সেই ডাক যেন বেজে ফিরতে লাগল। বসে পড়লেন পণ্ডিত উঠানে। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল হু হু করে। মৃত স্ত্রী, তার কোলে শিশু চাঁদি—যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল মুহূর্তের জন্য। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পণ্ডিত হাঁকলেন—বাঞ্ছারাম—

দুচার ডাকে বাঞ্ছারাম বেরিয়ে এল পাশের বাড়ি থেকে। চাষার ছেলে বাঞ্ছারামের মনটি বড়ো খাঁটি। লোকের চোখে গুরুপদ পণ্ডিত গরিব হোলেও বাঞ্ছারামের কাছে বড়ো দরের মানুষ। ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরের চাবি খুলে গাড়ু গামছা বের করে পা ধোবার জল দিল—সে ভাবেনি যে আজই ঠাকুরমশায় ফিরতে পারবেন। বাঞ্ছারাম বলল—দিদিমণিকে রেখে এলেন?

—হুঁ—

—সেবার আয়োজন করি ঠাকুর?

—আমি আজ আর কিছুই খাব না; ঘরে মিশ্রী তোলা আছে, তাই খেয়ে থাকব। তুই গিয়ে মণিরামকে খাইয়ে পাঠিয়ে দে, সেই আমার কাছে রাতে শোবে ও আমার ঘরের দুচারটা কাজ সেই করবে, আমি তাকে মাসে কিছু করে দেবো।

বাঞ্ছারামের ছেলে মণিরাম, বয়স তার তেরো বছর। তখন থেকে সে-ই পণ্ডিতের কাছে রইল।

দিন চলে—থেমে থাকে না। গুরুপদ পণ্ডিতেরও চন্দ্রমণিকে ছেড়ে দিন কেটে যেতে লাগল। মাসে একখানি করে পত্র তিনিও দেন—চন্দ্রাও তাঁকে লেখে। পরের মাসে মাহিনা পেতে পণ্ডিত দুটি টাকা চন্দ্রাকে মণিঅর্ডার পাঠালেন—খাম পোস্টকার্ড কেনারও তো খরচ আছে।

তিন

বাপ চলে যেতে প্রথম দিনটা চন্দ্রা কেঁদে অধীর হয়ে ছিল। বিধবাশ্রমে আর পাঁচজন ছাত্রী তাকে সান্ত্বনা দিল, বোঝাল, নানারকম গল্প করতে লাগল। চন্দ্রমণি সাধারণ মেয়ে থেকে কিছু গম্ভীর প্রকৃতির ও আত্মনির্ভরপরায়ণা, কয়েক দিনেই সে নিজেকে সামলে নিল। পড়ায় মন দিল খুব বেশি করে। শিক্ষয়িত্রীরা তার পড়ার যত্ন ও স্মৃতিশক্তির প্রখরতা দেখে পড়িয়ে সুখ পেতে লাগলেন—তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হোলো তার দিকে।

একজন শিক্ষয়িত্রী একদিন চন্দ্রাকে বললেন, তুমি ম্যাট্রিক পড়ার চেষ্টা করো না। তিন বৎসর পড়লেই তুমি ম্যাট্রিক দিতে পারবে। চন্দ্রা মাথা হেঁট করে রইল। তার যে একটি পয়সা খরচ করবার সামর্থ্য নেই, সে কথা শিক্ষয়িত্রী জানেন না।

আস্তে বলল—এখানকার পড়াইতো আগে শেষ করি!

দুই বৎসরে আশ্রমের পাঠ শেষ করে চন্দ্রা ট্রেনিংএ গিয়ে ভরতি হোলো বৃত্তি পেয়ে। উন্নতি হচ্ছে কিন্তু মনের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি তার ঘোচেনি। সেটা যেন একপাশে ঠেলে রেখে সে পড়ে চলেছে। মেয়ের আশ্রমের পাঠ শেষের খবর, ট্রেনিংএ ভরতি হওয়ার খবর—সবই বাপ যথাসময়ে জানতে পেরেছেন। মেয়ে নিজের শক্তিতে দাঁড়াচ্ছে—বাপের বুকের বোঝা এতে অনেকখানি নেমে গেছে। তবু যে জটিলতাটুকু জড়িয়ে গেছে চন্দ্রার জীবনে তার চিন্তা থেকেও বাপের মন একেবারে অব্যাহতি পায় না।

মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন নাই, কাকে আশ্রয় করে চন্দ্রার সারা-জীবন কাটবে—কে জানে। ভগবানকে স্মরণ করে এ ভাবনাও তিনি সরিয়ে ফেলেন।

চন্দ্রা ট্রেনিং পাশ করল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি জুটে গেল যশোর জেলায়, বেতন ৩০৲ টাকা, থাকার ঘর পাবে, চাকরি গভর্ণমেণ্টের। খবর পেয়ে বাপ ছুটে এলেন কলকাতায় মেয়ের কাছে। বাপকে দেখে মেয়ে বাপের পায়ের কাছে বসে অঝোরে কাঁদল খানিকক্ষণ। বিধবা পরিচয়ে বাড়ি ফেরার উপায় নাই। আজকের এই সৌভাগ্যে এটা বড়ো দাগা দিল তাদের বাপ মেয়ের জীবনে।

প্রথম মাসের বেতন পেয়েই সহপাঠিদের খাওয়ার জন্য দশ টাকা পাঠাবে ব'লে, স্থপারিণ্টেডেণ্ট মাসিমাকে প্রণাম করে, কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে চন্দ্রা যশোর যাত্রা করল বাপের সঙ্গে।

পণ্ডিতের শরীর অসুস্থ, তবু তিনি মেয়েকে একলা পাঠাতে পারলেন না কর্মস্থানে; দেখতে গেলেন সেখানকার ব্যবস্থাদি কী রকম।

স্কুলটিতে ছাত্রী প্রায় দেড়শো, শিক্ষয়িত্রী আছেন আরো তিনজন, তবু ট্রেনিং পাশ একজনের দরকার, তাই চন্দ্রাকে আনা। জেলার ডেপুটি বাবুর স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—তিনি স্কুলের সেক্রেটারি। বাপ মেয়ে দুজনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

কাতরচোখে পণ্ডিত তাঁকে বললেন, আমার মেয়েটিকে আপনার কাছে রেখে গেলুম, আপনি তাকে দেখিয়ে শুনিয়ে কাজ শিখিয়ে নেবেন। বয়স কম—আপনি ওর মাতৃস্থানীয়া অভিভাবিকার মতো মনে করে আমি ফিরে যাব। ব'লে পণ্ডিত তাঁকে নমস্কার করলেন।

ডেপুটিগৃহিণী বললেন, ভয় নাই, আমি বিশেষ দৃষ্টি রাখব, আমিও ছেলের মা।

বাপ বিদায় নিলেন। চন্দ্রা নিজের ঘরখানি দেখে নিল, কাজও বুঝে নিল কয়েকদিনের মধ্যে। নূতন শিক্ষয়িত্রীর সপ্রতিভ ভাব দেখে সেক্রেটারি মহাশয়া মনে মনে বড়োই সন্তুষ্ট হলেন। একটু মমতাও জন্মাল মেয়েটির প্রতি। বয়স তো বেশি নয়—অনুমান তেইশ চব্বিশ হবে।

চার

দুবছর চন্দ্রা কাজ করছে সেইখানে। মাহিনা বেড়েছে পাঁচ টাকা এবছরে। বাপের খুব অসুখ—খবর আসে—চন্দ্রা ছটফট করে, যাবার জো নাই। দেশে কেউ তার বিবাহ হোতে দেখে নাই, সে খবর কানেও শোনে নাই—তবে সে বিধবা হোলো কী করে। এ মুখ নিয়ে সে বাড়ি যায় কেমন করে।

চাকরি হয়ে পর্যন্ত চন্দ্রা বাপকে মাসে দশটাকা করে পাঠায় বাপ আর কাজ করতে পারেন না ব'লে। গ্রামের লোকে জানে পণ্ডিতের কুমারী মেয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে। কেউ তাকে টিটকারি দেয়, কেউ হাসে—কেউ বলে, ভালোই হয়েছে—পণ্ডিত বুদ্ধির কাজ করেছে। সে যে বিধবা পরিচয় দিয়েছে এ খবরটা গ্রামের কেউ জানে না।

এক বৎসর বাপের সঙ্গে চন্দ্রার দেখা নাই। হঠাৎ একদিন ডাক পিয়ন একখানি ইংরেজিতে লেখা রেজেস্টারি চিঠি চন্দ্রার নামে দিয়ে গেল। ডেপুটিগৃহিণী চন্দ্রার স্বভাবের গুণে তাকে বড়ো স্নেহ করেন। নিজেই দুই বছরে তাকে খানিকটা ইংরেজি শিখিয়েছেন, কিন্তু তাতে এতটা ইংরেজি চন্দ্রা শেখে নাই যাতে ইংরেজিতে হাতের টানা লেখা পড়ে বুঝতে পারে। চিঠি খুলে ঝাপসা মতন একটু পড়ে দেখে সে ভালো করে কিছু বুঝতে পারল না; ভাবল, আমাকে আবার রেজেস্টারি চিঠি দেবে কে। আমার তো বাবা ছাড়া আর কেউ নাই। নিচের এ সই তো বাবার নয়; এ চিঠি কে লিখল।

মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক জন্মাল, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা নিয়ে কাকিমাকে দেখাতে গেল। ডেপুটি গৃহিণীকে চন্দ্রা কাকিমা ব'লে ডাকে।

তাঁর একটি মা-মরা নয় বছরের ভাসুরঝি তাঁর সঙ্গে থাকে। সে তাঁকে কাকিমা ব'লে ডাকে, সেই সঙ্গে তিনি চন্দ্রারও কাকিমা হয়ে গেছেন। ডেপুটি বাবুর দুটি ছেলে, তারা কলকাতায় ঠাকুরমার কাছে থেকে পড়ে।

চিঠিখানা চন্দ্রা কাকিমার সামনে ধরতেই কাকিমা চোখ বুলিয়ে নিয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে চাইলেন—মুখখানা তাঁর মলিন।

বললেন, চন্দ্রা একটা দুঃসংবাদ এসেছে তুমি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও। ভয়ে চন্দ্রার বুকের ভিতর কাঁপতে লাগল, কী জানি কী খবর, বাবার কোনো ভালোমন্দ ঘটে নাই তো।

চন্দ্রাকে পাশে বসিয়ে তার পিঠে হাত রেখে ডেপুটি-গৃহিণী বললেন, চন্দ্রা তোমার বাবার স্বর্গলাভ হয়েছে। স্থানীয় উকিল শশীশেখর বসু পত্র দিয়েছেন, তাঁর বাড়ি ঘর জমিজায়গা যা কিছু আছে তোমাকে সেখানে গিয়ে দখল করতে। তুমি তাঁর একমাত্র ওয়ারিশ। শেষের কথাগুলা চন্দ্রার কানে মোটেই পৌছাল না। সে তখন আছড়ে পড়েছে কাকিমার পায়ের কাছে "বাবা বাবা" ব'লে ডুকরে কেঁদে উঠে।

ডেপুটিগৃহিণী তার মুখে হাতে জল দিয়ে তাকে ধরে বসালেন। শান্ত করে বললেন, স্কুলে পনেরো দিনের ছুটি নাও, তোমার কাকাবাবুকে বলি, তোমাকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। সেখানে গিয়ে বাবার শেষ কাজ তোমাকেই করতে হবে। আর যা কিছু তাঁর আছে, সে সব নিয়ে থুয়ে রেখে ঢেকে আসতে হবে। দাঁড়াও দেখি তোমার কাকাবাবু কী বলেন।

শোকের আঘাতের মধ্যেও চন্দ্রা আত্মসংবরণ করে বললে কাকিমা, আমি ও আমার বাবা একটি গুরুতর অপরাধ করেছি,—আমি বিধবা নই আমার বিবাহ হয় নি, অর্থাভাবে বাবা আমার বিবাহ দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতের উপায় করার জন্য কৌশল করে বিধবা-পরিচয়ে

বিধবাশ্রমে ভরতি করে বাবা আমাকে মানুষ করেছেন। বিধবা নাম নিয়ে এখন আমি দেশে যাই কী করে। বিষয়ই বা অধিকার করি কোন সর্তে। রেজিস্টারি আফিসে আমার বিধবা নাম চলবে না।

ডেপুটিগৃহিণী চমৎকৃত হয়ে গেলেন। চন্দ্রার জীবনে এমন একটি রহস্য লুকানো আছে এ তিনি কখনও কল্পনাও করেন নি।

এ স্থলে কী করা কর্তব্য ডেপুটিবাবু ছাড়া তিনি তার মীমাংসা করতে পারবেন না।

চন্দ্রাকে ও খুকিকে সেই খানে রেখে তিনি গেলেন স্বামীর কাছে। তাঁকে বললেন সব ঘটনা। ডেপুটি বাবু বললেন, ওকে কুমারী নামেই যেতে হবে, কুমারী নামেই বিষয় অধিকার করতে হবে, বিধবা নাম চলবে না।

পরের দিন কাকিমায়ের আগ্রহে ও প্রয়োজনের তাগিদে চন্দ্রাকে বিধবার সাজ বদলাতে হোলো। কয়েক বৎসরের অভ্যাসে তার চওড়াপাড় শাড়ি পরতে সংকোচ হোতে লাগল। তাই সে সরু দুগাছি চুড়ি হাতে ও নরুন পাড় শাড়ি কোনো রকমে পরতে সম্মত হোলো।

পাঁচ

পর দিন চন্দ্রা সকালে স্নান সেরে স্নেহপরায়ণা কাকিমার অনুরোধে স্বপাকে চাট্টি হবিষ্যান্ন রেঁধে খেয়ে ডেপুটি-বাবুর পুরাতন চাপরাশির সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করল।

হুহু শব্দে ট্রেন চলেছে, চন্দ্রার মনের ভিতরে শুধু হায় হায় শব্দ উঠছে। বাবা নাই—এ তার কেমনতরো অবস্থা ঘটল। কোথায় যাবে কার কাছে দাঁড়াবে কে জানে। আজ সে সকল দিকে ভরসাভাঙা; ভাঙাবুকের ভয় ভাবনা কতখানি বুক যার না ভেঙেছে সে জানে না। বাপের কাছ ছাড়া হয়েছে চন্দ্রা প্রায় সাত আট বছর। তবু বাপ আছেন, বুকের এ বল কম নয়। সে বাড়ি গিয়ে শূন্য ঘর কেমন করে দেখবে কী করে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। এক ভরসা পুরানো চাকর বাঙ্গারাম।

শোকের আঘাতে দুর্ভাবনার তাড়নায় চন্দ্রার বুক ও মুখ শুকিয়ে গেছে। ট্রেনের জানলার ধারে মাথা রেখে সে কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। তন্দ্রা ছুটে চন্দ্রা দেখল, নির্দিষ্ট স্টেশনে গাড়ি এসে পড়েছে, চাপরাশি এসে ডাকছে, দিদিমণি, নামতে হবে।

বৈকাল পাঁচটা নাগাদ সেই পুরানো পৈতৃক ভিটাখানিতে চন্দ্রা প্রবেশ করল, থরথরিয়ে পা তার তখন কাঁপছে। জড়ানো কথায় চাপরাশিকে বলল, পাশের বাড়ির বাঙ্গারামকে ডাকো। চাপরাশি বাঙ্গারামকে ডেকে আনল, চন্দ্রা তখন উঠানে বসে পড়েছে। বাঙ্গারাম ও তার বৌ শুনেই ছুটে এসেছে। তাদের দেখে চন্দ্রার বুকের চাপা কান্না উথলে পড়ল। বাঙ্গারামও কাঁদে হাউ হাউ করে।

একটু তারা স্থির হোতেই চাপরাশি বলল, বাবুমশায় আমাকে পরের ট্রেনেই ফিরে যেতে বলেছেন। আমি চললুম, গিয়ে মাঠাকরুণকে আপনার পৌঁছা সংবাদ দেব।

রাত্রিটা কোনো রকমে কাটল। বাঞ্ছারামের স্ত্রী চন্দ্রার কাছে শুয়ে; মণিরাম আজ কুড়ি বছরের ছেলে, সে শুলো দাওয়ায়।

পরদিন সকালে বাঞ্ছারামকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রা গেল উকিল বাবুর বাড়ি। তিনি তখন আদালতের নথীপত্র দেখতে ব্যস্ত। চন্দ্রাকে দেখে ও পরিচয় পেয়ে বসতে বললেন ও ডেস্ক থেকে একটা কাগজ বের করে তার সামনে ধরে বললেন—তোমার বাবা মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে আমাকে ডেকে এই কথাগুলি লিখিয়েছিলেন, তুমি শোনো,—"দশ বিঘে ধানের জমি, বাস্তু ভিটে, কতকগুলি আম কাঁঠাল নারকেল গাছ ও একটি ডোবা পুকুর সমেত আমার অবিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবীকে নিস্বত্ব হইয়া দান বিক্রয়ের অধিকার দিয়া গেলাম। এ ছাড়া সেভিংস ব্যাঙ্কে আমার যে তিনশ বাহাত্তোর টাকা জমা আছে তাহাও আমার কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী পাইবে এবং তাহা হইতে স্বল্পব্যয়ে আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিবে। উকিল শ্রীযুক্ত শশীশেখর বসু মহাশয়ের নিকট আমার সেভিং ব্যাঙ্কের পাশবই এবং বাড়ি ও জমির দলিল রহিল"।

চাকরির পরে চন্দ্রা বাপকে মাসে যে দশটাকা পাঠাত সে টাকাগুলি প্রায়ই বাপ খরচ না করে পোস্টাপিসে জমা রাখতেন—চন্দ্রারই কোনো কাজে লাগাবেন ব'লে।

উকিল বাবু দলিল ও পাশবই খানি বের করে চন্দ্রাকে দেখালেন ও বললেন—আমি সই দেব, পাশবুক থেকে টাকা তুলে তুমি তাঁর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করো।

চন্দ্রা বলল, আপনি দয়া করে ফর্ম ইত্যাদি লিখিয়ে রাখবেন—কাল আমি এসে সই দিয়ে টাকা তুলব, আজ আমার মন বড়ো অস্থির।

গুরুপদ পণ্ডিতের স্বজন কেউ নাই যে এ সময়ে চন্দ্রাকে সাহায্য করে। বাপের শেষ কাজ শেষ করতে হবে তারই চিন্তায় চন্দ্রার মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিসে বাপের আত্মা প্রীত হবেন, এই ভাবনা অন্তরের তলদেশ থেকে তাকে নাড়া দিতে লাগল। সে ঠিক করল স্কুলের শিশু ছাত্রদের মিঠাই খাওয়াবে ও বাঞ্ছারামের পরিবারের সকলকে একখানি করে নূতন কাপড় কিনে দিয়ে অল্পের মধ্যে পরিতৃপ্ত হবে। শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠানিক ব্যয় আন্দাজ একশ টাকার মধ্যে শেষ করতে পারবে।

উকিল বাবুকে বলে সে দেড়শ টাকা পাশবুক থেকে উঠাল, শ্রাদ্ধাদি কার্য শেষ করে উকিল বাবুর পরামর্শ মতো রেজেষ্ট্রি অফিসে গিয়ে নাম লিখিয়ে সে জমি-জায়গা-বাড়ির দখল নিল। অল্প কিছু ব্যয় করে বাড়িখানি একটু মেরামত করে বাঞ্ছারামের উপর ভার রেখে কর্মস্থান যশোর অভিমুখে একাকী রওনা হোলো। কাকিমাকে পত্র দিল, আমি অমুক তারিখে পৌছাব কাকিমা—আপনার স্নেহই আমার এখন একমাত্র সম্বল। যাবার সময় ফ্রেমে বাঁধানো ছোটো একখানি বাবার ফটো ও তাঁর নিজের হাতে নাম লেখা কয়েকখানি পুরানো গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে গেল। চন্দ্রার খুলে যাওয়া পিতল-রংএর বালা দুগাছি বাপের হাত-বাক্সে পাওয়া গেল। বাঞ্ছারামের হাতে বালাদুগাছি দিয়ে চন্দ্রা বলল—মণিরামের বৌ হোলে তাকে এই দুগাছি বালা দিস্ বাঞ্ছারাম। মনে মনে স্থির করল, কর্মস্থানে গিয়ে বিধবাশ্রমে দুইশ' টাকা পাঠিয়ে দেবে—সকল কথা খুলে লিখে। আশ্রমের কাছে সে চিরঋণী, তবুও এই টাকাটুকু দিয়ে সে মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারবে—অন্যায়ের যৎসামান্য প্রতীকার করা হোলো ভেবে।

ছদ্ম

রবিবার দুপুরে খাওয়া সেরে ডেপুটিবাবু শোবার ঘরের মেজেয় পুরু গদিপাতা বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়ছেন, কাছে বসে ডেপুটিগৃহিণী উলের জামা বুনছেন নতুন ভাইপো হয়েছে তাকে দেবেন ব'লে। এমন সময় চন্দ্রমণি আসার খবর এল, তার লেখা চিঠিতে। স্বামীকে বললেন,—চন্দ্রা কাল আসছে বেচারীর জন্য বড়ো মায়া করে। তিন কুলে তার কেউ নাই, একবাপ ছিলেন, তিনিও গেলেন, মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী সৎচরিত্রা, উন্নতমনা। আমরা বদলি হয়ে চলে গেলে ও একলাটি কী করে থাকবে তাই ভাবছি,হালকা প্রকৃতির সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে সে তেমন ভালো করে মিশতে পারে না।

—মেয়েটি দিব্যি স্বাস্থ্যসম্পন্না, বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রীতে লাবণ্য ঢল ঢল করছে—বয়স অনুমান কত হবে।

—ছাব্বিশ সাতাশ হোতে পারে—

—কুমারী মেয়ে, সৎপাত্রে বিবাহ হওয়া উচিত, আমার মনে হয়।

—হোলে তো ভালোই হয়, সম্বন্ধ করে কে। বিবাহ হোতে গেলে উদ্যোগী হয়ে কাউকে দাঁড়াতে হয়।

—তুমিই জোগাড় করো না কেন।

—আমি কাকে চিনি, কাকে বলব, কাকে ধরব। আমার কথায় কে বিয়ে করবে বলো।

—আচ্ছা তোমার মামাত ভাই অঙ্কুর এখন কী করছে।

—আমাদের অঁকু? সে এখন স্কুলমাস্টারি করে, এম, এ পরীক্ষা দিয়ে ফল বেরোবার আগেই ননকো-অপারেশনে ভিড়ে গেল। সেই

থেকে কলেজ স্কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ তার ত্যাগ। ভাগ্যি পরীক্ষাটা আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তাই এম এ ব'লে একটা চাকরি জুটেছে।

তার সঙ্গে তোমার চন্দ্রমণির বিবাহ হোলে কেমন হয়। স্বজাতি ভিন্নগোত্র—কিছুই বাধে না। তোমার মামিকে একবার ব'লে দেখো না।

অঁকু কারো কথা শুনে না, নিজের মতে চলে। মামিমা তার বিয়ের জন্য কত না চেষ্টা করেছেন। শেষে অনুমতি নিয়ে ছোটো দুই ছেলের বিবাহ দিলেন। অঁকুর এমন কিছু বয়স হয়নি যে বিয়ে করা চলে না। তবে সে যে রকম একরোখা তাতে তার মত করানো শক্ত। চন্দ্রার সঙ্গে মানায় বটে, অঁকুর বয়স তেত্রিশ, আমার চেয়ে চার বছরের ছোটো। কথাটা একবার পেড়ে দেখব। তবে মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখা করাতে হবে, সম্বন্ধ করে কাজ হবে না।

সেদিনের মতো সেইখানেই কথা শেষ।

পরদিন চন্দ্রমণি এসে পৌঁছাল, কাকিমা কাকাবাবুকে প্রণাম ক'রে চোখের জল মুছে কাজে গেল ঠিক সময়।

খবর এল, আগামী মাসে ডেপুটিবাবুকে পূর্ণিয়া যেতে হবে—বদলি হয়েছেন।

গোছগাছ শুরু হোলো। যাবার দিন এসে পড়ল দেখতে দেখতে। মালপত্তর আগেই রওনা হোলো। ডেপুটিবাবু সপরিবারে গাড়িতে উঠলেন সন্ধ্যার সময়।

যাবার সময় চন্দ্রমণিকে গৃহিণী বলে গেলেন,—চন্দ্রা, সাবধানে থেকো, তোমার কাকাবাবুর ও আমার ইচ্ছা তোমার বিবাহ হয়। সৎপাত্রের সন্ধানে আছি। পেলেই জানাব—তুমি অমত কোরো না।

চন্দ্রা মাথা হেঁট করে মাটির দিকে চেয়ে রইল, কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল চোখ থেকে।

হাটতলা

এক

ষষ্ঠীতলার হাট। সোম-শুক্র দু'দিন হপ্তায় হাট বসে। দশখানা গ্রামের লোক এই হাটে হাট করে। হাট বসার এমনতরো উঁচু ফাঁকা জায়গা বিশ ক্রোশের মধ্যে নাই। বুড়োরা বলে, একশো বছরেরও বেশি নাকি হাট হচ্ছে এইখানে, যাতায়াতে পায়ে পায়ে পথ পড়েছে সকল দিকে।

কোনকালে কোন জমিদারগৃহিণী পাঁজিপুঁথী ঘেঁটে, দিন-ক্ষণ দেখে, ব্রাহ্মণপুরোহিত ডেকে, মন্ত্র পড়ে মাটিতে অশ্বত্থ-বটের দু'টি শিশুচারা পুঁতে অক্ষয় পুণ্য অর্জন করে গেছেন কেউ তার সঠিক খবর বলতে পারে না। চলতি কথায় লোকমুখে কাহিনীর মতো শোনা যায়, সেইদিনের সেই সমারোহ,—লক্ষ কাঙালী ভোজন, হাজার ব্রাহ্মণকে গো-দান, ভূমি দান, স্বর্ণখণ্ড দক্ষিণা।

সেকেলে সোনার কাঁচা-হলুদ-ঢালা রংএর গহনায় গা ভরিয়ে, বুটি-তোলা বালুচরের চেলি পরে জমিদার-গৃহিণী দাঁড়িয়েছেন অশ্বত্থ-বটের শিশুদুটি হাতে নিয়ে। সংকল্পের মন্ত্র পড়ছেন পুরোহিত, ঘিরে দাঁড়িয়েছে গ্রামের হাজার মানুষ, মা-নামের জয়ধ্বনিতে মাঠ মুখরিত হচ্ছে মুহূর্মুহু। কল্পনায় এ দৃশ্যের ছবি এখনো গ্রামের মানুষ দেখে থাকে। সন্ধ্যায় মা ছেলে ঘুম পাড়ান এই কাহিনীর বর্ণনা করে।

পুরানো জমিদার বংশ লোপ পেয়েছে। নিজের জমিদারিতে তারা এখন নিঃশ্চিহ্ন, কেবল বিরাটদেহ অশ্বত্থ-বট দুটি অসংখ্য ডালপালা মেলে জমিদারগৃহিণীর কীর্তি ঘোষণা করছে আজো।

বট-অশ্বত্থের গুঁড়ি ঘেঁসে লেপা-পোঁছা মূর্তি আঁকা চ্যাপটা চৌকোণ পাথর একখানা কে জানে কেমন করে এসে পড়ল দুটি গাছের মাঝখানে একদিন।

গ্রামের পুরোহিত ঠাকুরের স্নানের বেলায় চোখে পড়ল পাথরখানি —মা ষষ্ঠীর আবির্ভাব ব'লে রটিয়ে দিলেন তিনি গ্রামে, ফুল, বিল্বপত্রে নদীর জলে পূজা করলেন তখনি গ্রামের লোক ডেকে মা ষষ্ঠীর কৃপা ভিক্ষা করে—সেও আজ অনেকদিনের কথা।

গ্রামের যত শিশুর ষষ্ঠীপূজা শুরু হোলো সেইথেকে এই মা ষষ্ঠীর কাছে, নাম-ডাক দাঁড়িয়ে গেল যষ্ঠীতলা, হাট-খানারও নাম দাঁড়াল ষষ্ঠীতলার হাট।

পুরানো জমিদার বংশের শেষ বংশধর দেনায় জড়িয়ে, বিষয় উড়িয়ে, জমিদারি নিলামে চড়িয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে শান্তিধামে গমন করেছেন বিশ বছর হোলো। কলিকাতার প্রসিদ্ধ উকিল ত্রিভুবন গোস্বামী জমিদারিখানি নিলামে কিনে, দখল নিয়ে শৃঙ্খলা এনে, আদায়-পত্র করতে শুরু করেছেন সুনিয়মে। ফলে জমিদারির উন্নতি হয়েছে অনেকটা। কৃতী বাপের সুসন্তান রত্নরেণু বাপের আজ্ঞায় বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে ব্যারিস্টারিতে না বসে, বাপের কেনা নূতন জমিদারিতে বসত করে দেশের কাজে প্রাণ ঢেলেছেন সম্প্রতি। শিখে এসেছেন সে দেশ থেকে, দেশের প্রাণে প্রাণ মিশালে প্রাণ পাওয়া যায় ষোলো আনা। বাবা বলেন, রোজগারে মন দিবি নে খোকা, টাকা আসবে কোথা থেকে। ছেলে বলে—মাটি থেকে সোনা ফলাব বাবা, মাটির কোলেই সোনার খনি সবাই জানে।

—দেখ্, যা হয় কর্—তোরা একালের ছেলে একালের ধর্ম বুঝিস ভালো।

বাপের পদধূলি মাথায় নিয়ে রত্নরেণু মনের মতো কাজ ক'রে যায় নিজের মনে।

দুই

কনকনে শীত। হাটতলায় হাওয়া বইছে হু হু। ঝড় বৃষ্টি-রোদ-ঠাণ্ডা-সওয়া চাষী, মাঝি, সাঁওতালের দল গাড়ি বোঝাই, বস্তা বোঝাই নিজেদের মাল নিয়ে হাটতলায় পৌঁছে গেছে আগের রাতে, দূরগ্রামে ঘর ব'লে। মাল আগলে পড়ে আছে তারা খড় বিছিয়ে গাছের তলায়, গাড়ির তলায়, কেউ বা টিনে ঘেরা ছোটো ছোটো ছাউনি-গুলির নিচে।

অন্ধকারে ঢাকা ভোরে কাছের গাঁয়ের মাল নিয়ে লোক আসতে শুরু করেছে দলে দলে, হাটতলাটা ছেয়ে ফেলছে দোকান পশরায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভীড়, বেচাকেনার ধুম, খরিদ্দার-দোকানদারের দর-কষাকষির কলহ, পথচলা মানুষের গায়ের ঠেলা, পায়ের সাড়া, কথার কলধ্বনি হাটতলা সরগরম করে রাখছে হাটবারে।

গ্রামে জন্মানো ফলমূল, ক্ষেতে জন্মানো শাকসবজি, তরি-তরকারি তালপাতার চাটাইএ রাশ করে ঢালা, ধারে ধারে কাঁচাকলা-পাকাকলার বড়ো বড়ো কাঁদি। কাঁদিকাটা টাটকা ডাব, ঝুনো নারকোল গাদা করে ঢেলে রেখেছে তার পাশে। তেলি-তামলি চাষীর ঘরের ভাজা খৈ-মুড়ি, ঢেঁকি ছাটা সরু চিঁড়ে, সুগন্ধী নলেন গুড়ে পাক-করা মুখরোচক মুড়কি, ফুল বাতাসা বিক্রি হচ্ছে তোলায় তোলায়।

একটু স'রে মেছো হাট। পুকুর-নদীর রাতে-ধরা ঝাঁকা ভরা রুই-কাতলা, চিংড়ি-চিতল, ছাঁচে ধরা চুপড়ি ভরা চুনো-পুঁটি, গামলা-ভরা জলে কৈ-মাগুরের ঝাঁক, কলসীর মধ্যে চ্যাং ল্যাঠা, শোল মাছের

গাঁদি। বাগদি বুড়ির চুপড়িতে চিতি কাঁকড়া, গুগ্‌লি বাদ পড়ে না বেচতে।

পুব দিকে জোলাদের জ্যালজ্যেলে গামছা কাপড়, সাঁওতালদের ঠাসবুনুনি মোটাখাপি ধুতি শাড়ি, পাটের ছাঁটের কেটে কাপড় গাঁটরি-বোঝাই বেচতে বসেছে ব্যাপারীর দল।

মাটির হাঁড়ি, কলসী, মালসা, সরা, গামলা, ভাঁড়, কাঠের বারকোশ, বাটি, কেটো, ছটাক, পোয়া, সের-মাপা, রং ধরানো কুনকে, বাঁশের কুলো, ডালা, চুপড়ি, চ্যাটাই, চাঙারি নিয়ে বসেছে কুমোর, কামার, জাতডোমেরা। কম বয়সি সাঁওতাল মেয়ে পরা-কাপড়ের আঁচলখানা টান করে গায়ে এঁটে কোমর বেড়ে আঁচলার খুঁটটা পাশে গুঁজেছে, খোঁপায় জবার ফুল। মালা, ঘুনসি, সিকে, কাঠের চিরুনি, টিনে মোড়া ছোটো আয়না, হাতে গড়া মাটির পুতুল ফেরি করে ফিরছে তারা সারা হাটের এদিক ওদিক। বাউলের নাচ, বৈরাগীর গানও চলছে একধারে।

নূতন জমিদারের আমলে হাটের উন্নতি হয়েছে নানা দিকে। জমিদারের ছেলে ব্যারিস্টার রতনবাবু—গ্রামের লোকে রত্নরেণু ভারি নামটা বলতে না পেরে তাঁকে রতন বাবু বলে ডাকে—এদিকে নজর দিয়েছেন খুব। চাকর সঙ্গে সকালে হাট করেন নিজে। পরনে মোটা ধুতি, গেঞ্জি, শীতের সময় বালাপোষ একখানা জড়ানো থাকে গায়ে। দরদাম যাচাই করা কেনাবেচার তদন্ত রাখা তাঁর মতলব। কেউ না ঠকে কেউ না ঠকায় কড়া চোখ রাখেন সেদিকে। বেলা তিনটায় ভাঙা হাটে হাট দেখাতে আনেন তিনি খুকিকে, খুকির মাকে, মেয়েরা হাটের সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে পরিচিত হয়—তাঁর ইচ্ছা।

ফরমাশি চওড়া নমুনার গোরুর গাড়ি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তিন দিক ঘেরা, সামনে খোলা। রতন বাবু স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে সেই গাড়ি চড়ে হাটে আসছেন বেলা ন'টার সময় পৌষসংক্রান্তির হাট করতে। কাল

সংক্রান্তি, পিঠেপার্বণের বেজায় ধুম গ্রামে। ব্যারিস্টার পত্নীর দেখাদেখি গ্রামের আরো পাঁচবাড়ির বৌঝিরা ঘরের বাবুদের সঙ্গে পছন্দসই বাছাই জিনিস কিনতে এসেছে পার্বণের হাটে। এই সূত্রে জমিদার-পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে আরো পাঁচ রকমের সুবিধা পাবার ইচ্ছা তাদের। ব্যাপারটা গ্রামে নূতন বটে তবে চোখে সয়ে আসছে সকলকার। মেয়েদের হাট করায় কী আনন্দ। দোকান উজাড় করে তারা জিনিস নিতে চায়। বলাবলি করে, হাটটা পুরুষের না হয়ে মেয়েদের হোলেই ভালো হোত। ঘরকন্না রাঁধা বাড়া করতে হবে আমাদেরই তো। হাটের জোগাড় না পেলে রাঁধি কী। ব্যারিস্টার পত্নী বন্দিতারও সেই মত। স্বামীকে বলেন, মেয়েরা হাটের মধ্যে যেমন মিলতে পারে এমন কোথাও নয়। মনটা খুলে যায় হাটের মেলায়।

বন্দিতা দেবী বি-এ, পাশ। বিলাতও ফিরে এসেছেন গত বছর। স্বামীর মনে মন মিশিয়ে শিখে এসেছেন সে দেশ থেকে দেশ বিদেশে মিল ঘটিয়ে দেশের কাজের নূতন ধারা। ফল ফলাবে দেশের মাটি দেশের কাজে রইবে খাঁটি—মূলমন্ত্র।

বন্দিতা মাটিতে নেমে খুকির হাত ধরে হাট করছেন মেয়েদের দলে মিশে। হঠাৎ সাত বছরের মেয়ে স্বছন্দা চেঁচিয়ে উঠল কেঁদে। মা মা, পায়ে কামড়েছে। ব্যস্ত হয়ে মা তাকে কোলে তুলে কী হয়েছে, কোথায় কামড়েছে দেখি—বলে তার হাতপাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন। পাশ দিয়ে বিষেভরা কালো রঙের প্রকাণ্ড এক পাহাড়ে কাঁকড়া বিছে সর্ সর্ করে সরে যাচ্ছে দেখা গেল। দেখতে দেখতে খুকির মুখখানাতে কে যেন নীল রং মাখিয়ে দিল। মেয়েকোলে হাট-তলায় বসে পড়লেন বন্দিতা। মেয়ের দল ঘিরে ফেলল মা-মেয়েকে। রতনবাবু দৌড়ে এলেন, হাটকরা মানুষরাও অনেক জড়ো হোলো সেখানে। বিষাক্ত বিছে কামড়ালে মানুষ মারা পড়ে, আতঙ্কে সবাই

অস্থির। মাধু সাঁওতাল লোহা বাঁধানো লাঠির ঘায়ে বিছেটাকে থেঁৎলে মেরে ছুটে আসছে সেই দিকে, হাতে একমুঠি বুনো ঘাস,—কাউকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ঘাসগুলো দাঁতে চিবিয়ে, মুখের লালা মিশিয়ে খুকির কালশিটে পড়া কামড়ানোর জায়গাটায় সে বসিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ। কী কী ব'লে সবাই উঠল চেঁচিয়ে।

—জড়ি মশাই জড়ি, বিছের বিষ পুড়িয়ে ছাই করবে এমন জড়ি।

মেয়ে কোলে মা তখন হতজ্ঞান—মাধুকে বললেন, বাঁচাও আমার খুকিকে, তোমার কাছে কেনা হয়ে থাকব চিরকাল।

নিমেষ ফেলতে মাধু সাঁওতাল হাঁটু পেতে বসে গেল সামনে। নিজের হাত দু'খানা শূন্যে আলগা রেখে চালাতে লাগল খুকির সারা গায়ে, যেন ছড়ানো বিষ জড়ো হয়ে আসছে তার হাতের টানে। হাত এক পাক ঘুরে আসে, দু' পাশে হাত দু'খানা ঝাড়ে মাধু যেন বিষ ঝরে পড়ছে পাশের মাটিতে। থেকে থেকে সজোরে ফুঁ দেয়, ছাতির জোরে ফুঁয়ে মাধুর হাওয়ার হাউই ছোটে। বিড় বিড় করে সাপের মন্তর আওড়ায়, বোঝা যায় না একটি কথা তার। ঘণ্টা খানেক চলেছে ঝাড়ফুঁক্, বিষের ঝোঁক কাটিয়ে খুকি চোখ মেলে চাইল। হৈ, হৈ, করে উঠল হাটের হাজার মানুষ। অজ্ঞাত আনন্দে বাপ-মায়ের বুক ভরে উঠল। রতনবাবু দশ টাকার নোট একখানা হাতে নিয়ে মাধুকে বললেন,—নে মাধু তোর পুরস্কার।

—দোহাই বাবুজি, ওস্তাদজির নিষেধ,—সত্যনারানের সিন্নি দেবেন, টাকা দেবেন না। গরিব আমরা, গুরু, ওস্তাদ মানি বেশি, টাকা চিনি না অত করে।

অশিক্ষিত সাঁওতালের মনে মনুষ্যত্বের খাঁটি রসটুকুর পরিচয় পেয়ে রতনবাবুর মানুষ-মনের উপরে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল অনেকখানি। না-শেখা মানুষ নিজে কত বড়ো কে জানে।

মাধুকে দেওয়া হোলো না কিছু ; ব্যস্ততার মধ্যে সেদিন যে যার ঘরের দিকে ফিরল—মাধু গেল সাওতাল-গাঁয়ে নিজের ঘরে। বন্দিতা ও খুকিকে নিয়ে রতনবাবু বাড়ির দিকে চললেন গরুর গাড়ি চেপে। স্থানীয় ডাক্তার সুকীর্তি ঘোষ লোকমুখে বাবুর বিপদের খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন হাটতলায়, খুকিকে তখন গাড়িতে তোলা হয়েছে। সঙ্গে চললেন তিনি খুকির পাশে গাড়িতে বসে—সত্যনারায়ণের সিন্নি, মাধুর পুরস্কার জাগতে লাগল মা-বাবার মনে বেশি করে।

তিন

রবিবার অ-হাটের দিন। ভোর থেকে মাধু সাঁওতালের বৌ ফুলঝুরি মাটির মালসায় গোবর গোলা জল রেখে ষষ্ঠীতলার চারিপাশটা নিকোতে বসেছে—সঙ্গে দু'জন সাওতাল সঙ্গিনী। রাতে মাধু লম্বা চওড়ায় এক শ' হাত জমি মেপে দাগ দিয়ে রেখে গেছে সেটা তাদের নিকোতে হবে সব।

ছেঁড়া পাটের টুকরো মালসার জলে ডুবাচ্ছে আর লেপছে তারা তিন জনে; পরিচ্ছন্ন হয়ে মাটিটা ফুটে উঠছে যেন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মেটে পাথরখানি।

হাসি-ঠাট্টা-গল্পে সময়টা কাটছে তাদের বড়ো খুশিতে। চোখে মুখে খুশি খেলছে হাসির সঙ্গে কথার সঙ্গে।

ফুলঝুরির গলায় দুলছে বড়ো একগাছা গাঁদার মালা, খোঁপায় কাঠি-গাঁথা গাঁদাফুলের সার।

সঙ্গিনী সোহাগী বলল তোর গলায় গাঁদাফুলের মালা দুলিয়ে দিল কে রে ফুলঝুরি।

—কেন, আমার বর।

—বরটা তোর ক্ষেতে খাটে না মালা গাঁথে। বরমুখো বৌ তুই, বর তোর বৌমুখো।

—তুই তো তা' বলবি, তোর বর কোন মুখো রে, পুব মুখো না পশ্চিম মুখো।

—বর আমার পুবমুখে গিয়ে পশ্চিম মুখে ফেরে, সোহাগী তার পুবেও নাই, পশ্চিমেও নাই।

—সোহাগী তার থাকে তবে কোথায়।

—হেঁসেল ঘরে, ভাতের হাঁড়িতে, ভাত না পেলে পিঠে পড়ে কিল।

—তোর বর বুঝি তোকে মারে রে।

—হাঁ—মারে বৈকি—গোরুকে জাব না দিলে, ছাগলগুলোকে না চরালে, ভাতগুলো ফুটিয়ে না রাখলে, পিঠে পড়বে গুমাগুম ঘা। মা-বাপে নাম রেখেছে সোহাগী, সোহাগ তার কাছে নাই এতটুকু।

—মর্, তুই রাঁধিস কেন তার ভাত, চরাস কেন ছাগল, গোরুকে দিস কেন খেতে, শুকিয়ে মরুক সব। কোন মুখো ঘর তার বুঝবে তখন সে। সোহাগীর মুখ না দেখে সুখ পাবে না কোনো খানে, দেখবি তখন।

—তোর বর বুঝি তোর মুখ দেখে রে সারাদিন।

—সারাদিন মুখখানা সে পাবে কোথায়। চাষের জমির আবাদ সারতে সূর্যি ঠাকুর পাটে বসেন। রাঁধা ভাত ক্ষেতে নিয়ে পৌছে দিতে বেলা যায়, প্রাণটা আমার ছটফটিয়ে ওঠে। সন্ধ্যা বেলা ফেরার পথে আমার জন্যে রাশখানেক ফুল আনে সে রোজ। মালা গাঁথে, গলায় পরায়, সোহাগ করে কত রঙের ফুল গেঁথে, কতদিন।

—তোর বর বুঝি তোকে খুব ভালবাসে।

—হাঁ খুব ভালবাসে, আমি তাকে ভালবাসি তার চেয়েও বেশি।

দূরে বসা চাঁপা শুনতে পায় নি সকল কথা। কাল রাতে তার ঘুম হয়নি ঢুলছিল সে থেকে থেকে। সোহাগী চেয়ে বলল—চাঁপা বুঝি ঢুলে মরছিস—কাজ করছিস খুব, মাধু সর্দার আসুক, দেব ব'লে—দেখবি মজা।

—রাখ্ তোর চোখ রাঙানি, ঢুল দেখেছিস কোন চোখে, তোর বকবকানির ধার ধারে কে। মাধু সর্দারের মন ভোলাবি রঙ্গ করবি তার সঙ্গে দিচ্ছি ব'লে বাড়ি গিয়ে তোর বরের কাছে—পিটি দিয়ে পিঠ ভাঙবে সে।

চার

দূরে মাধু সর্দার হাঁক দিচ্ছে শোনা গেল সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়ে ফিরছে তখন সে। ষষ্ঠীতলায় সাঁওতাল ভোজ, মেয়েপুরুষে একশো সাঁওতাল নিমন্ত্রণ, রতনবাবুর আয়োজন, মাধু সর্দারের ব্যবস্থার ভার। স্বছন্দা সেরে গেছে সম্পূর্ণ, ভোজ খাওয়ানো সিন্নি বাঁটার আনন্দে যোগ দিতে আসছে তারা মা মেয়েতে পাড়ার মেয়ের দল সঙ্গে নিয়ে। পরিবেশনের ভার আজ মেয়েদলের উপর—সাঁওতালরা বসে শুধু ভোজ খাবে মাধু সর্দারের পুরস্কারের দৌলতে। পূজো দিয়ে বাঁকে করে হাঁড়ি ভরা সিন্নি নিয়ে মাধু সর্দার পৌঁছে গেল হাটতলায়। গোরুর গাড়ি বোঝাই করে ছালা ভরা চিঁড়ে মুড়কি, বিশটা পাকা কলার কাঁদি, মন দুই চিনি পাতা দৈ এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। তাড়া বাঁধা শাল পাতার গাদাও এল কম নয়।

বাড়ি থেকে আনা পিতলের ঘটিতে টিউবওয়েলের জল ভরে, পাশে রেখে, খেতে বসেছে সাঁওতালের দল—এক সার মেয়ে এক সার পুরুষ। গ্রামে রতন বাবু চোদ্দটা টিউবওয়েল করিয়েছেন, দু'টো তার হাটতলায়। পরিবেশনে লেগেছেন মুনসেফ গৃহিণী শুকতারা, নব পরিণীতা ডাক্তার-পত্নী স্বর্ণতুলিকা, রতন বাবুর ছোটো বোন কুন্তলা ও স্বয়ং বন্দিতা।

টুকটুকে লাল শাড়ি পরা সাত বছরের মেয়ে স্বছন্দা মায়ের পিছু পিছু ফিরছে সেও এক আধটা ফরমাশ খাটতে চায়।

জোড়া জোড়া শালপাতা সামনে পাতা, বাটির মতো বড়ো খোলের লম্বা বাঁটের লোহার হাতায় মাধু সিন্নি বাঁটছে সবার পাতে। ছন্দারানী মাকে ধরেছে নুন দেবে সে। মা বললেন সাবধানে দাও, নুন ছিটিয়ো না চারদিকে। পাতার ঠোঙায় নুন নিয়ে ছোটো একখানি পাতলা হালকা কাঠের চামচেতে নুন তুলে দিচ্ছে ছন্দারানী পাতে পাতে। ঝুড়ি ভরে মুড়কি চিঁড়ে সরায় তুলে পাতে ঢালছেন বন্দিতা ও স্বর্ণতুলিকা। দইয়ের হাঁড়ি মুনসেফ গৃহিণীর হাতে। কুন্তলা ছড়া থেকে কলা ছিঁড়ে খোসা ফেলে পাতে দিচ্ছে সকলকার। দে, নে, আরও চাই, রব উঠেছে চারদিকে। আনন্দ কোলাহলের ঘটা পড়ে গেছে হাটতলায়।

খেয়ে সবাই পরিতৃপ্ত, উঠছে পাতা ছেড়ে, দূর থেকে বিরাম বৈরাগীর খঞ্জনীর আওয়াজ এল কানে, ফিরে চাইল যত লোক। বৈরাগী আসছে আগে আগে, পিছে কুঞ্জকলি, তার বারো বছরের মেয়ে। হাটের মানুষ চেনে তাদের খুব, কোনো হাট ফাঁক যায় না বিরাম বৈরাগীর গান না শুনে। বৈরাগী গায়, বাজায়, কোকিলকণ্ঠি কুঞ্জকলি প্রতি কলি ফিরে ফিরে দোয়ার দেয়—ভাবরসে ডুবে যায় শ্রোতার মন হাটের হট্টগোল ছাপিয়ে। আজ এদের কাছে পেয়ে, উৎসুক হয়ে ফিরে দাঁড়াল মেয়ের দল, বাবুর দল, সাঁওতালের দল, রব উঠল গান শোনাও বৈরাগী ঠাকুর একটি গান শোনাও। ভিড় ঠেকিয়ে পাশে ডেকে, চিঁড়ে-মুড়কি, কলা দিয়ে বাপ-মেয়েকে রতন বাবু জল খাওয়ালেন আগে, দই এক হাঁড়ি সঙ্গে দেবেন ঠিক রইল।

বৈরাগী গান ধরেছে, বুকখানা উজাড় ক'রে রস ঢালছে সুরের সঙ্গে, ভাবে মেতে কুঞ্জকলি তান দিচ্ছে পর্দায় পর্দায়। ভরা পেটে অলসমনে আবেশে অবশ হয়ে শুয়ে ব'সে শুনছে শ্রোতার দল।

বিরাম বৈরাগী গাইছে—

"রাধানাথ আসবে কবে আর—
দিন কেটেছে তোমা বিনা
রাত কাটা যে ভার।… "

অকস্মাৎ বুকে পিঠে ব্যথা ধরে, জ্ঞান হারিয়ে হাত-পা কেঁপে পড়ে গেল বৈরাগী গাছতলায়। হাতের খঞ্জনি হাতে রইল, হাত-পা বাঁকতে শুরু হোলো। ডাক্তারবাবু ছুটে গেলেন তৎক্ষণাৎ। চোখে দেখেই বললেন—ধনুষ্টংকার। ইনজেকসন আনতে হবে ডাক্তারখানা থেকে, ততক্ষণ টিকলে হয়। লোক ছুটল ডাক্তারখানায়, ডাক্তারবাবু হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করতে লাগলেন যন্ত্রযোগে। পাঁচ মিনিটে ফুরিয়ে গেল সব, ইনজেকসন পৌছল না এসে। কুঞ্জকলি আছড়ে পড়ল বাপের বুকে, বাবা গো কোথা গেলি গো ব'লে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল যত লোক। কথা সরে না কারো মুখে। গতিক দেখে ডাক্তারবাবু মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, উঠিয়ে নাও মেয়েটিকে আস্তে আস্তে ওখান থেকে। খবর দিন রতনবাবু বৈরাগী-পাড়ায় ওদের দলের লোক ডাকতে।

ব্যবস্থা হোতে লাগল। কুঞ্জকলি পাগলের মতো কাঁদছে পড়ে, মেয়েরা টেনে তুলতে পারে না তাকে।

বিবাগী বাউল ভিক্ষা সেরে ফিরছে তখন বাড়ির দিকে। হাটতলার গোলযোগে কাছে এসে ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়ে গেল সেও। কুঞ্জকলির কান্না দেখে বলল, কী রে কলি, কাঁদছিস কেন। তোর বাবার হোলো কী।

—বাবা গো—বাবা আমার—বাউলদাদা, বাবা আমার হারিয়ে গেল হাটতলায়।

বাউল বৈরাগীতে ভাব ছিল অনেক দিনের। দু'জনে এক প্রাণ—এক মন—অভিন্ন হৃদয়, বাসাও পাশাপাশি।

শোনা মাত্র বাউলের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল, যেন খালি হয়ে গেল বুকের সবটা। মুহূর্তে সামলে নিয়ে সে বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরা গুপীযন্ত্রের তারে দিল ঘা, সঙ্গে সঙ্গে পায়ে জাগাল তাল, ঘা-দেওয়া তার ডেকে উঠল—গাব গুবাগুব গুব।

আকাশের পানে তাকিয়ে বিবাগী বাউল গাইছে—

"হায়রে খেলা হায়রে মেলা।
হায়রে ভবের সুখ······"

সুদর্শনের সংসার

এক

সুদর্শন বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে বাপের মনটাকে আনন্দে ভরিয়ে দিল, প্রতিদিন বাপছেলেতে সন্ধ্যায় ব'সে আলোচনা চলতে লাগল, এর পরে সুদর্শন কী করবে কোন্ লাইন ধরবে। বাপের বড়ো সাধ, ছেলে উকিল হয়ে কোর্টে বসে। কী জানি কালে যদি রাসবিহারী ঘোষই বা হয়ে পড়ে, গোপনে এ আকাঙ্খাও বাপ মনে পোষণ করেন।

মায়ের চিন্তা অন্যদিকে। কবে ঘরের লক্ষ্মী বৌমা আসবে তার জন্যই তাঁর মন ব্যস্ত সারাক্ষণ। সম্প্রতি পাশের বাড়ির ঘোষাল গিন্নির বোনঝি এসেছে গরমের ছুটিতে পনেরো দিনের জন্য মাসির বাড়ি বেড়াতে। মেয়েটির নাম দেবপ্রিয়া। সুদর্শনের মা দুপুরে পাড়া বেড়াতে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এসেছেন। চোখের দেখাতেই তাঁর দেবপ্রিয়াকে মনে ধরেছে খুব। বাড়ি এসে কর্তাকে ধরে পড়েছেন, ঐ মেয়েকে আমার বৌ ক'রে দিতে হবে, নাই বা তারা দু'পয়সা দিল, নাই বা তাদের দু'পয়সা থাকল।

কর্তা হরিহর চাটুজ্যে সাবধানী ও বিবেচক লোক। সামান্য অবস্থায় শহরে এসে আজ সওদাগরী অফিসের এসিস্টেণ্ট কেসিয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ঢোকেন প্রথমে কুড়ি টাকা বেতনে। বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার ফলে আজ তাঁর এই পদোন্নতি। গ্রামের স্কুলে অল্প বয়সে তিনি ম্যাট্রিকটা পাশ করেন। বিদ্যার্জন সেইখানেই শেষ; কলিকাতার ব্যয় জুটিয়ে কলেজে পড়া তাঁর পক্ষে আকাশ কুসুম। বাপ ছিলেন

জমিদার বাড়ির পূজারী ব্রাহ্মণ; বাবুদের গ্রামের স্কুলে ফ্রিতে পড়ে হরিহর মানুষ তাকে কলেজে পড়ায় কে। বাপ ধরে পড়ায় বাবুদের সুপারিশে কলকাতায় ঐ সওদাগরী অফিসে তার কুড়ি টাকা মাহিনার কাজ জোটে কুড়ি বৎসর বয়সে। সেই থেকে এত দূরে এসে দাঁড়িয়েছেন আজ হরিহর। গ্রামের জমি জায়গা বাগান পুকুর বেচে পৈতৃক ভিটার চিহ্ন স্বরূপ টিনের ছাদ দেওয়া মাটির ঘর দুখানি রেখে আজ তিনি কলিকাতাবাসী। উঁচু ফ্লোরের উপর কলকাতায় সুন্দর ছবির মতো তিনখানি ঘরওয়ালা নতুন একটি বাড়ি করেছেন একতালা। সঙ্গে রান্না-ঘর, স্নানের ঘর, গোরুর ঘর, সব স্বতন্ত্র। ব্যবস্থা এত পরিপাটি যে দেখলে চোখ জুড়ায় ও কর্তাগিন্নি দুজনেরই নৈপুণ্য প্রকাশ পায় যথেষ্ট।

বাপের ইচ্ছা, ছেলেকে ওকালতিতে ঢুকিয়ে বিবাহের উদ্‌যোগ করা। বি, এ, পরীক্ষার ফলের প্রতীক্ষায় রয়েছেন বসে; মায়ের কিন্তু ততটুকু সবুর সইছে না; আজই তিনি তাঁর সুদর্শনের বিবাহ দিতে চান। তাঁর ধারণা, সুদর্শন কখনই ফেল করবে না। অতএব এখনি বিবাহ দিলে ক্ষতি কী। বিয়ে করেই না হয় ছেলে আইন পড়বে। কর্তার যত বাড়াবাড়ি—আগে পরীক্ষার খবর বের হোক, তবে বিয়ের ব্যবস্থা।

যাই হোক গৃহিণীর কথাই বাহাল রইল। কর্তার গিয়ে ঘোষাল গিন্নির বোনঝি দেবপ্রিয়াকে দেখে আসতে হোলো। সত্যই মেয়েটি বড়ো সুশ্রী। দেখলে পছন্দ না ক'রে পারা যায় না।

দেবপ্রিয়ার বয়স পনেরো; বেথুন স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। বাপ নাই—মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে থেকে সে মানুষ। মামারা বিয়ে দেবেন হাজার দুই খরচ ক'রে। পরে তত্ত্বতালাসের দায়ে তাঁরা মাথা দিবেন কি না সন্দেহ। ঘোষাল গিন্নির কাছ থেকে এই ভিতরের খবরগুলি

সুদর্শনের মা জোগাড় ক'রে এনে দিলেন কর্তার কাছে, সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য দিলেন, কী করা যায় তারা যা দেয় দেবে, অমন মেয়েটি তা ব'লে হাত ছাড়া করা যায় না। তুমি মত ক'রে ফেলো। এই বৈশাখেই আমি বিয়ে দিতে চাই।

কর্তা বললেন, তোমার এক ছেলে, একটু খরচ পত্রও তো করতে হবে এত তাড়াতাড়ি কেন। গৃহিণী বললেন, আমার এক ছেলে, তার আর বিয়ের খরচ জুটবে না। এতই বা ধুমধামের কী আছে। এক তোমার বিধবা বোন আছে দেশের বাড়িতে; তাকে আনা ছাড়া আত্মীয় স্বজন আনার আর তো কোনো ঝঞ্ঝাট তোমার নাই। আমার একটি মাত্র বোন, সে থাকে বোম্বাইএ স্বামীর কাছে, তাকে একখানা চিঠি দেওয়া মাত্র—সে আসতে পারবে না সহজে, এ তো জানা কথা। সামনে জ্যৈষ্ঠ মাস, আমার জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে সে-মাসে হবে কী ক'রে।

এদিকে এক কথায় দেবপ্রিয়ার মামারা হোলো রাজি। সুদর্শনের সু-দর্শন চেহারাখানি দেখে মন না ভোলে কোন্ মেয়ের অভিভাবকের। অবস্থা স্বচ্ছল, সৎ ছেলে, মামারা আদর ক'রে ভাগ্নি দিলেন তার হাতে বিনা দ্বিধায়। আনন্দে সকলের মন ভরে গেল। সুদর্শন সোনার চোখে বৌ দেখল শুভদৃষ্টির সময়। মায়ের একমাত্র মেয়ে দেবপ্রিয়া মায়ের গলা জড়িয়ে চোখের জল ফেলে শুভলগ্নে এল শ্বশুর বাড়ি।

দুই

সুদর্শনের বিয়ের পর আট নয় বছর কেটে গেছে। হরিহর চাটুজ্যের নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে নানাদিক থেকে, পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। বিয়ের দু বৎসর পরে দেবপ্রিয়ার কোলে যখন ছয়মাসের শিশু, হরিহর ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে হঠাৎ মারা গেলেন বাহান্ন বৎসর বয়সে। পরিবারের বুকের মাঝখানে জলছিল একটা যে বড়ো রকমের আলো, দপ করে সেটি নিবে গেল এক ঝাপটায়। সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন ওকালতির প্রথম পরীক্ষায় ফেল করল।

মা স্বামীর শোকে প্রায় শয্যাশায়ী; সুদর্শন বসে থাকে মায়ের কাছে বেশি সময়; ছোটো শিশুটিকে শাশুড়ির কোলের কাছে শুইয়ে রেখে দেবপ্রিয়া একাই সংসারের সব কাজ সারে দুই হাতে।

ওকালতি পড়াটাই ধরে থাকবে কি বাপের আফিসের বড়ো সাহেবকে ব'লে সেখানে একটা চাকরি নেবে এই চিন্তাটা সুদর্শনের মনে আসে যায়, ভাবায় তাকে অনেকখানি। মা ও দেবপ্রিয়া দুজনেই বললেন, কর্তার যখন ইচ্ছা ছিল তোমার উকিল হওয়া, তখন সেই চেষ্টাই আগে করতে হবে।

দেবপ্রিয়া বললে, বাবা নেই ব'লে বাবার কথা ফেললে চলবে না,—তোমাকে ওকালতিই পড়তে হবে।

সুদর্শন বলল,—ঘরের খেয়ে পড়ার খরচ জুগিয়ে চলবে কতদিন সেটা ভেবে দেখো, এই তো প্রথম পদক্ষেপেই ব্যর্থ হলুম, ঠিক ঠিক পাশ

করেই যে যেতে পারব প্রত্যেকবার, তাই বা কী বলা যায়। তিনবৎসর টানা পড়তে হবে, কম দিন তো নয়।

দেবপ্রিয়া বলল—চাকর ছাড়িয়ে দেব, খুব কম খরচে চালাব, তাতেও কি তিন বৎসরের ব্যয়সংকুলান হবে না, বাবা তো কিছু রেখে গেছেন।

সুদর্শন বলল—আড়াই হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আর এই বাড়িখানা ছাড়া আর তো বাবার কিছু নাই ; এতে সংসার চলবে, পড়ার ব্যয় চলবে—এতটা ভাবা দুঃসাহসের কাজ। যাই হোক, সুদর্শন আইন পড়তে লাগল, বাবার অফিসে ঢোকার চেষ্টা দিল ছেড়ে।

আফিসের বড়োবাবু সুদর্শনকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন,—তোমার বাবার কর্মকুশলতায় ও সততায় আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলুম, তাঁর একবৎসরের বেতন আফিস থেকে দেওয়া হবে তোমাকে,—ব'লেই তিনি বারোশো টাকার একখানি চেক লিখে সুদর্শনের হাতে দিলেন। হরিহরবাবুর মাহিনা ছিল একশত টাকা।

সুদর্শন চেক নিয়ে বাড়ি এসে মায়ের হাতে দিল। চেক দেখে মায়ের দুই চোখে দরদর ধারায় জল পড়তে লাগল, বললেন,—তুই নে, যা ভালো হয়—কর্‌গে ; ওসবের দিকে তাকাতে আর আমার ইচ্ছা নাই।

সুদর্শন মায়ের চোখের জলের দিকে চেয়ে বললে,—মা তুমি শান্ত হও, আমি মানুষ হয়ে বাবার নাম রাখতে চেষ্টা করব, আর এই খোকা তোমার কাছে রইল, ওকে তুমি মানুষ কোরো। দেবপ্রিয়াকে তো সারাদিন সংসার নিয়ে থাকতে হবে, তুমি না দেখলে খোকাকে দেখবে কে। এই ব'লে মায়ের কোলে খোকাকে তুলে দিলে।

খোকা খেলতে লাগল ঠাকুরমায়ের কোলে ; সুদর্শন উঠে গিয়ে দেবপ্রিয়ার কাছে বললে,—

—বড়োসাহেব বাবার কাজের পুরস্কার স্বরূপ আমাকে এই বারোশো টাকা দিয়েছেন। চেকটা ভাঙিয়ে টাকাটা এখন সেভিং ব্যাঙ্কে জমা

দিয়ে রাখি। হাতের কাছে থাকলে যখন যেমন দরকার তুলে আনতে পারব।

দেবপ্রিয়ার মুখখানা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—বলল—দেখলে, বাবা তোমার পড়ার খরচ পাঠিয়ে দিয়েছেন—ব'লে শ্বশুরের উদ্দেশ্যে জোড়হাত ক'রে প্রণাম করল।

দিন যায়—সুদর্শনের পড়া চলছে, দেবপ্রিয়া সংসারে খাটে, মা নিজের হবিষ্যি ভাত রেঁধে নেন, খোকাকে দেখেন ও সুদর্শনের খাবার সময় নিয়মিত বসেন। সুদর্শনের পেট না ভরলে তাঁর নিজের খাওয়া মুখে রোচে না।

ভাগ্য যখন বিরূপ হয় তখন মানুষের সুবিধা ঘটেও ঘটে না, সকল সুযোগই ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়েও সুদর্শন ফেল করল; সুদর্শন বুদ্ধিমান ছেলে, তবুও যে সে বারংবার ফেল করছে সেটা অদৃষ্টের ফের বলতে হবে বই কি—দেবপ্রিয়া এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিল। ব্যর্থতার খবর শুনে মায়ের মন মুষ্‌ড়ে পড়ল—অবসাদ-গ্রস্ত জীবনে নূতন অবসাদের ভার চেপে পড়ে খুব বেশি। মা ভাবলেন, এর পরে আর কি সুদর্শন পড়তে পারবে। দেবপ্রিয়ার মন দমে নাই তবে সুদর্শন যখন বুঝিয়ে বললে, আর তার পড়া চলবে না, বারোশো টাকা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে এই এক বৎসরে খেয়ে ও পড়ার খরচ চালিয়ে —তখন দেবপ্রিয়ার মন বুঝল যে পড়া আর সম্ভব নয়।

দেবপ্রিয়া বুদ্ধিমতী। সহজ সত্যবুদ্ধির আলোতে তার মনখানি ভরা। অন্যায় আবদার, বাজে কল্পনা, অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা তার সরল সুস্থ মনে স্থান পায় নাই। স্বামীকে বলল, ছেড়ে দাও ওকালতির আশা, চেষ্টা করো উপার্জনের।

প্রতিদিন সকালে সুদর্শন খবরের কাগজ পড়ে কোথায় কর্মখালি সেই খোঁজ করে সর্বাগ্রে। ভালো চাকরি মেলা ভার। সেটা বুঝতে

তার দু'তিনমাস সময় কেটে গেল। শেষে কাগজ দেখে একটা টিউশনি জোগাড় করল মাসিক পনেরো টাকার,—একটি ছেলেকে ম্যাট্রিক ক্লাশে কোচ করতে হবে। তিনমাস বসে আছে হাত পা গুটিয়ে—আর তো চলে না। উপস্থিত পনেরো টাকার টিউশনিটাই স্বীকার করল। কাজ করছে সুদর্শন, কিন্তু পনেরো টাকায় হবে কী। কোম্পানীর কাগজের সুদটুকুর ভরসা, তাতেও সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়। ওদিকে ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেই তার বাপ সুদর্শনকে জবাব দিলেন। নিরুপায় সুদর্শন অন্ধকার দেখল চোখে। একটা বুদ্ধি ঠাওরাল নিজের মনে। দেবপ্রিয়ার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কোম্পানীর কাগজ ভাঙিয়ে একটা মোটর কিনল সস্তায় পেয়ে। সকাল বিকাল তাই ভাড়া খাটিয়ে দিন চার পাঁচ টাকা উপার্জন করতে লাগল। টিউশনি ছেড়ে বসে থাকার সময় একটা মোটরকোম্পানীতে ঢুকে খুব অল্পদিনে সে মোটর চালানো শিখে নিয়েছিল। ভদ্রলোকের ছেলে, ট্যাকসি খাটিয়ে পেট চালাবে, ভদ্র-সমাজে সেটা বড়ো লজ্জার। কিন্তু পেটের দায়ে মানুষকে কী না করতে হয়। এ তো চুরি ডাকাতির চেয়ে ভালো—স্বাধীন ব্যবসা, হোলোই বা ছোটো দরের।

তিন

এইভাবে আট বৎসর সুদর্শন ট্যাকসির কাজ ক'রে সংসার চালাচ্ছে। সময় সময় রোজগার হয় খুব বেশি, সময় সময় কিছু কম। বর্তমানে একরকম স্বচ্ছলে চললেও ভবিষ্যতের ভাবনা সুদর্শন একেবারে ভুলে থাকতে পারে না। আট বৎসর ব্যবহারে পুরানো-দরে-কেনা মোটরখানি, অতিমাত্রায় ঘোরাঘুরির ফলে প্রায় অচল হয়ে এল এবং সেখানি বদল দিয়ে ঘরের জমানো কোম্পানীর কাগজ কিছু পরিমাণ ভাঙিয়ে একখানি নূতন মোটর কিনতে হোলো তখন ভয় ভাবনা দুইই তার মনে চেপে বসল অনেকখানি। ট্যাকসির ব্যবসায় খরচা পুষিয়ে লাভ থাকে মন্দ নয়, দেখা গেছে কিন্তু নূতন ট্যাক্সি কেনার মূলধন সে জোগাতে পারে না। কাজেই ভাবনার কথা জড়িয়ে রইল ব্যবসায়ের সঙ্গে। বারংবার মূলধন জোগাবে কে। এদিকে পরিশ্রমও কম নয়। বড়োদিনের ছুটির সময় ট্যাকসিতে লাভ হয় খুব যদিও দিনরাত সেই সঙ্গে খাটুনি বাড়ে যথেষ্ট। থিয়েটার বায়স্কোপ, সারকাসে যাওয়ার ধুম সেই সময় বেশি। বাড়ি ফিরতে কোনোদিন রাত একটা কোনোদিন দুইটা হয়ে যায় সুদর্শনের। এ বছর শীত পড়েছে খুব বেশি। রাতে ঠাণ্ডা লেগে সুদর্শনের একদিন চেপে সর্দি জ্বর এসে পড়ল। জ্বরের প্রকোপ দেখে মায়ের বিষম ভাবনা। এইরকম সর্দিজ্বরে স্বর্গীয় কর্তার ইনফ্লুয়েঞ্জায় দাঁড়াল দুদিনে, শেষে তাইতে তাঁর জীবন শেষ হয়েছিল—সেইকথা স্মরণ ক'রে মায়ের মন দমে গেল প্রথম থেকেই।

জ্বরের সময় সুদর্শনের মুখে এক কথা,—আমার অসুখের এই কটা দিনে লোকসান হোলো কিন্তু বড়ো বেশি। এইটাই তো রোজগারের সময়। চার পাঁচ দিনের কামাইয়ে দুশো আড়াইশো টাকা হাতছাড়া হোলো।

দেবপ্রিয়া বলে, অত ভাবনা ভেবো না, ভগবান একটা ব্যবস্থা করবেন, তুমি আগে সুস্থ হও।

পাঁচদিনে এযাত্রা সুদর্শন সেরে উঠল। দুর্বলতা খুব বেশি তবু পথ্য পেয়েই সে কাজে বেরুল। পাঁচ-ছ দিন কাজ করেই আবার একদিন সন্ধ্যার সময় একটু জ্বর দেখা দিল। রাতে কিছু না খেয়ে সুদর্শন শুয়ে পড়ল বিছানায়। পরদিন সকালে আবার বেরুল ট্যাকসি নিয়ে দেবপ্রিয়ার মানা না শুনে।

বলল,—ফিরে আসছি দশটার মধ্যে, এসেই খেয়ে বিশ্রাম করব। এখন না গেলে পাঁচটা টাকা লোকসান হয়।

শুনে দেবপ্রিয়ার মুখখানা শুকিয়ে গেল—বাধা দিতে সাহস হোলো না।

সেই থেকে সুদর্শনের প্রায়ই মাঝে মাঝে জ্বর হয়—কোনোদিন কাজে যায় কোনোদিন পারে না। কত রকম দুর্ভাবনা তার মনে আসে দেবপ্রিয়াকে খুলে সে সব কথা বলা চলে না। বিছানায় ব'সে একদিন সন্ধ্যায় দেবপ্রিয়াকে বলল—

দেখো দেবু, আমি ভাবছি, তোমাকে মোটরের কাজটা শেখাব, দরকার হোলে তুমিও ওটা সময় সময় চালাতে পারবে। আমি যদি অপারক হই তখন কী হবে ; একটা উপায় ক'রে রাখা ভালো।

—বলো কী। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি ট্যাকসি চালিয়ে রোজগার করতে পারি। পাগলের কথা ; লোকে দেখলেই বা বলবে কী। তোমার যত আজগুবি কল্পনা।

—না দেবু, বুঝছ না, হয়তো সময়ে আমার কথাটা কাজে লাগতে

পারে। যাই হোক, কাজটা তো তুমি শিখে রাখো, করা না করা নিজের ইচ্ছা।

দেবপ্রিয়া নিরলস কর্মদক্ষ মেয়ে। পাদুখানির বিরাম নাই, সারাদিন ঘুরে সংসারের কাজ করায় সে অভ্যস্ত। হাতের কাজেও পারিপাট্য আছে বেশ। অল্প দিনেই সে মোটর চালানো শিখে নিল। সুদর্শন একদিন স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে পুলিশ অফিসে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে দেবপ্রিয়ার নামে একখানা লাইসেন্স বের ক'রে আনল।

নূতন কাজে দেবপ্রিয়া উৎসাহ বোধ করতে লাগল ও শাশুড়িকে এসে বলল,—তোমাকে লুকিয়ে মা, আমরা একটা কাজ করেছি। উনি আমাকে মোটর চালানো কাজটা শিখিয়েছেন, আজ আমি লাইসেন্স পেয়েছি।

শাশুড়ি বিস্মিত হয়ে বললেন,—একালের কাণ্ড, আমরা সেকালের মানুষ, এর ভালোমন্দ বুঝি না। খোকা যখন তোমাকে এটা শিখিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ফল এর ভালো হবে। স্বামীর চেয়ে বড়ো শিক্ষাদাতা গুরু কে। সে যা বলে তুমি তাই করো। ভাগ্যে তোমার মাসি এ-পাড়া থেকে চলে গেছেন, নতুবা বড়ো লজ্জার বিষয় হোত। খোকাই ড্রাইভারের কাজ করাতে লজ্জায় আমি তাদের কাছে মুখ দেখাতে পারতুম না। তার পর তোমার দ্বারা এ কাজ করানো সমাজের চোখে যে কতখানি অশোভন হবে ভেবে পাই না; তবু আমি এতে অমত করব না।

ছয় মাস কেটে গেছে,সুদর্শনের এখন রোজ জ্বর আসে। পাড়ার বড়ো ডাক্তার কে, ঘোষ দেখে বলেছেন জ্বরটা কালাজ্বর, সহজে সারবার নয়, তবে আজ কাল কালাজ্বরের চিকিৎসা বেরিয়েছে, ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে অনেককে তিনি সারিয়েছেন, সুদর্শনকেও সারাতে পারবেন, তাঁর বিশ্বাস।

ভিজিট দেওয়ার ভয়ে সুদর্শন তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখিয়ে আসে। কাছেই ডাক্তারের বাড়ি, তবুও সেইটুকুই হেঁটে যাওয়া সুদর্শনের পক্ষে কষ্টসাধ্য। দেবপ্রিয়া মোটর চালিয়ে সুদর্শনকে ডাক্তারের বাড়ি নিয়ে যায়। দুতিনদিন ডাক্তার লক্ষ্য করলেন, রোগীর স্ত্রী মোটর চালিয়ে রোগীকে নিয়ে আসে। বড়ো ঘরের মেয়েরা অনেকে আজকাল মোটর চালান, তিনি দেখেছেন ও জানেন কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে মোটর চালায় এটা দেখলেন তিনি এই প্রথম।

একদিন সুদর্শনকে বললেন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি—

—বলুন—

—আমার দুটি মেয়ে আছে, একটি কলেজে পড়ে একটি স্কুলে। ডাক্তারের গাড়ির ভরসা নাই ; আমি আটটায় বেরই, বাড়ি ফিরতে দেড়টা দুটো বাজে। মেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠাতে হয় ট্যাকসিতে। দৈনিক ভাড়া পড়ে প্রায় দু'টাকা যেতে আসতে। তা ছাড়া দরোয়ানকে রাখতে ও আনতে সঙ্গে যেতে হয় দুই দফায়। অল্প সময়ের জন্যও দরোয়ান সরে গেলে আমার অসুবিধা হয় যথেষ্ট। তবু না দিয়ে করি কী। আপনার স্ত্রী যদি ওদের দুই বেলা দিয়ে ও নিয়ে আসেন তবে আমি নিশ্চিন্ত মনে লোক সঙ্গে না দিয়ে ওদের পাঠাতে পারি। এজন্য মাসে চল্লিশ টাকা বরাদ্দ করতে আমি প্রস্তুত আছি।

দেবপ্রিয়াকে না জিজ্ঞাসা করেই সুদর্শন ডাক্তার ঘোষের প্রস্তাবে সম্মতি জানাল এক কথায়। পরদিন ন'টায় দেবপ্রিয়া সুদর্শনকে খাইয়ে, খোকাকে স্কুল পাঠিয়ে, একদফা ঘরের কাজ সেরে, ডাক্তার ঘোষের দুয়ারে মোটর নিয়ে হাজির।

ডাক্তার ঘোষের মেয়ে দুটি শিক্ষিতা, সুন্দরী, নাম দীপ্তশিখা, পুণ্যশিখা। মেয়ে দুটি হাসিমুখে মহিলা ড্রাইভারটির দিকে চেয়ে দেখে বলল—

আপনি বোধ হয় আমাদের স্কুল চেনেন না, চলুন আপনাকে প্রথম দিনটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই। আপনাকে পেয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছেন, বুড়ো কেশরী সিংকে আর আমাদের সঙ্গে যেতে হবে না! আপনি মোটর চালাতে শিখলেন কোথায়। আমাদের একটু শিখিয়ে দেবেন।

—বেশ তো, শিখবেন।

মোটর হু হু শব্দে চলে বারো মিনিটে স্কুলে পৌঁছে গেল। বাড়ি ফিরে সুদর্শনের পুরানো চালের গলা ভাত, সিঙ্গী মাঝের ঝোল তৈরি করে তুলল দেবপ্রিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে, স্বামীকে খাইয়ে স্নান করে শাশুড়ির কাছে গিয়ে নিজের নূতন রোজগারের খবর দিল।

শাশুড়ি দুই হাত বৌএর মাথায় রেখে আশীর্বাদ করে বললেন— তোমার গুণে সুদর্শন যদি এ যাত্রা বাঁচে বৌমা।

দেবপ্রিয়ার দুই চোখ জলে ভরে এল।

সংসার খুব কষ্টে চলে—তবু এই নূতন রোজগারের ফলে অনাহারে পরিবারটিকে শুকিয়ে মরতে হয়নি। মাসে গোটা বারো টাকার পেট্রোলে স্কুলে যাতায়াত চলে যায়, বাকি টাকায় দেবপ্রিয়া খরচ চালায়। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে পাড়ার মেয়েদের কালিঘাট, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর ঘুরিয়ে এনে আরো দু'চার টাকা দেবপ্রিয়া রোজগার করে।

চার

দৈনিক যাতায়াতে দীপ্তশিখা পুণ্যশিখার সঙ্গে দেবপ্রিয়ার খুব ভাব হয়েছে, তারা একদিন নিজের মাকে নিয়ে দেবপ্রিয়ার বাড়ি বেড়াতে এল। ডাঃ ঘোষ মহামনা ব্যক্তি, আভিজাত্যের অভিমানে মোটর ড্রাইভারের ঘরে স্ত্রী ও মেয়েদের পাঠাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন। তিনি নিজে কৃতি পুরুষ—কৃতিত্বের মর্যাদা তিনি বোঝেন। দেবপ্রিয়ার শ্রম-পরায়ণতা ও দায়িত্বজ্ঞানকে তিনি একান্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে লাগলেন। দামী ঔষধাদি অনেক সময় স্বদর্শনের জন্য তিনি পাঠিয়ে দিতেন নিজের স্ত্রীর হাত দিয়ে। ডাক্তার ঘোষের যত্নে ও সুচিকিৎসায় স্বদর্শনের জরটা আজ মাসখানেক হোলো বন্ধ হয়েছে। আরও এক মাস সেইভাবে কেটে যাওয়ার পর ডাঃ ঘোষ বললেন,—

—এবার আপনি এক-আধটুকু কাজ করতে পারেন, যেমন খবরের কাগজে সংবাদ সংগ্রহ করে দেওয়ার কাজ, ঘরে বসে কাগজ পড়ে সেগুলি লিখে পাঠানো যায়। তাতে কুঁড়ি পঁচিশ টাকা মাসে রোজগার হোতে পারবে। আপনি ইংরেজি তো ভালোই জানেন।

খবরের কাগজ খুঁজে একদিন স্বদর্শন একটা কাজের সন্ধান পেলে—মাসিক পত্রিকার জন্য গল্প ইত্যাদি ইংরেজি থেকে তর্জমা ক'রে দিতে হবে, লেখা পিছু দশটাকা পারিশ্রমিক। মাসে যদি দুটো লেখা দিতে পারে তবে বিনা খরচায় ঘরে বসে কুড়িটাকা রোজগার হবে।

ডাঃ ঘোষের পরামর্শকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে মাসিক পত্রিকার অফিসে সুদর্শন একটা চিঠি পাঠাল, সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বেয়ারা ইংরেজি ম্যাগাজিন কয়েকখানা দিয়ে গেল—সম্পাদকের দাগ দেওয়া অংশগুলি তর্জমা ক'রে দিতে হবে—তাতে লেখা আছে। সুদর্শনের বাংলা লেখার হাত খুবই ভালো—অভাবের চাপে সেদিকটা তার খুলতে পায়নি, এখন তর্জমা পাঠানোর সঙ্গে সুন্দর মৌলিক প্রবন্ধও লিখে পাঠাতে লাগল। তাতেও দু'পয়সা ঘরে আসে। দেবপ্রিয়া সংসার-খরচে সেটুকু ব্যয় না ক'রে পেট্রল কিনে রোজ সন্ধ্যার সময় সুদর্শনকে মোটরে বেড়িয়ে আনে।

সুদর্শন সুস্থ হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে তার একটা খবরের কাগজের অফিসে পঞ্চাশ টাকা বাঁধা মাহিনার চাকুরি জুটে গেল। প্রথম মাসের মাহিনা এনে দেবপ্রিয়াকে বলল,—

এইবার তুমি কাজ ছেড়ে দাও।

—তা হোতেই পারে না। ডাক্তার ঘোষের মেয়েদের কাজটা আমি কিছুতেই ছাড়ব না। ওটাই আমার লক্ষ্মী। বেশ তো, তুমি রোজগার করো, আমার রোজগারের টাকায় আমি দেশের ভিটাটাকে নূতন ক'রে মেরামত করাব, উঠান ঘিরে নূতন পাঁচিল দেব; পিসিমা তো ভিটায় থাকেন তিনিই সব দেখবেন। যদি আমরা কাজে অক্ষম হয়ে পড়ি তখন গ্রামে গিয়ে বাস করব কলকাতার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে—খোকার ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে।

—এত ভাবনা তোমাকে ভাবতে শেখালে কে।

—কেন, তুমি ও খোকা—তোমাদের ভাবনা ভাবতে গেলে ঐ কথা-গুলো আপনিই আমার মনে এসে জোগায়; এ তো স্বাভাবিক।

—যার স্বভাবে এটা সহজ তারই পক্ষে এটা স্বাভাবিক, সকলের নয়, মন ও বুদ্ধিটা সহজে সত্যে গিয়ে ঠেকে না সকলের—বাঁকা পথে বেঁকে

পড়ে অনেক সময়। বাঁকাচোরার বিপদ কম নয়। সোজা পথে বাঁচে মানুষ সকল সময়।

সুদর্শনের এই দার্শনিক তথ্য দেবপ্রিয়ার মনে তেমন বসল না।

সে বলল—যাই তোমার জন্য গরম লুচি ও মোহনভোগ ক'রে আনি, তুমিও খাবে খোকাও খাবে।

প্রসাদ

এক

পুরানো নহর স্থানটি নগরের শেষ প্রান্তে এক খণ্ড বৃহৎ পতিত জমি —স্থানীয় রাজাদের প্রায় পাঁচ পুরুষ আগে এই স্থানে বসতবাটি ছিল। স্থানটা পছন্দ না হওয়ায় তাঁরা নগরের মাঝখানে প্রাসাদ বানিয়ে বাস করছেন, পুরানো নহরে পড়ে আছে শুধু ভিটার আঁকা বাঁকা ভাঙা ভিত। রাজবাটি স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু বাস্তুদেবী শ্যামাকালীর মূর্তি স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। দেবমূর্তি নড়াতে নাই ব'লে মন্দির বিগ্রহ যেমন তেমনি রয়েছে আজও। নিত্য পূজা ভোগাদির ব্যবস্থা ষোলো আনা বজায় আছে পূর্বের মতো। তাল তাল চন্দন ঘষা, রাশি রাশি মালা গাঁথা, ঝকঝকে করে ঠাকুর ঘরের মেঝে ধোয়া, ত্রুটি হয় না একটুও, পুরোহিত ঠাকুর পূজায় বসেন যথা নিয়মে, মন্ত্রাদি উচ্চারিত হয় নিখুঁত ভাবে।

ভূতপূর্ব পুরোহিত ছিলেন তন্ত্রমতের সাধক। শাস্ত্রজ্ঞান ছিল তাঁর অসাধারণ, নাম ছিল কালিকানন্দ আগমবাগীশ। স্তোত্র আওড়াতেন তিনি সকাল সন্ধ্যা নিজের মনে অনবরত, স্নানাহার কোনো সময়েই সেটা বাদ যেত না। পূজায় বসে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একাহারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নিষ্ঠার অবতার। সকলেই ভক্তিতে মাথা নত করত তাঁর পায়ে। রাজবাড়ির পুরুষ নারী সকলেরই তিনি ছিলেন দীক্ষাগুরু। সেদিক দিয়েও তাঁর প্রতিপত্তি ছিল না কম। মন্দির সংলগ্ন মাটির বাড়িতে ছিল তাঁর বাস। গ্রন্থরাশি ছিল তাঁর সম্পদ। দেবত্র সম্পত্তির আয়ে দেবীর পূজা ভোগাদির যাবতীয় ব্যয় ও পুরোহিতের

পরিবার প্রতিপালন হোত খুব স্বচ্ছন্দে। পুরোহিত-ঠাকুরানীকে গা-ভরা সোনার গয়না দিয়েছিলেন রাজমাতা পুণ্যমালা দেবী। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

বর্তমানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সিদ্ধপুরুষ কালিকানন্দের পুত্র যোগানন্দ বাপের পরে পৌরোহিত্যপদ পেয়েছিলেন। তিনি বাপের কাছে তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রাদি শিক্ষা করার সঙ্গে কতকটা ইংরেজিও শিখেছিলেন আধুনিক কালের মতো। নিজের ছেলেকে তিনি পুরো আধুনিক দস্তুরে কলেজে পড়িয়ে বি-এ, পাশ করিয়ে স্বর্গগত হয়েছেন। দেবীবর বি-এ পাশ করেছেন বটে কিন্তু পৈত্রিক পৌরোহিত্য পদ ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। নিয়মিত পূজাপাঠ তাঁকেই করতে হয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও।

মানুষ যে বিদ্যা আয়ত্ত করে তার চর্চা না করে সে থাকতে পারে না। রাজপুরোহিত দেবীবরও নিজের ইংরেজি শিক্ষাটুকুকে কাজে না লাগিয়ে থাকতে পারেন নি। পুরানো নহরের মাইল খানেক দূরে একটি গ্রাম্য পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। পাঠশালাটির নাম শ্যামাকালী পাঠশালা। দেবীর নামে পাঠশালাটির প্রতিষ্ঠা। সেকেলে বাংলানবীশ দুজন বুড়ো পণ্ডিত এযাবৎ পাঠশালার কাজ চালিয়ে এসেছেন। দেবীবর শিক্ষার নূতন ধারা প্রবর্তনা করে প্রায় সেটিকে মাইনর স্কুল করে তুলেছেন। শ্যামাকালী পাঠশালা নাম পরিবর্তনের উপায় নাই, কারণ দেবীর নামে নামকরণ। দুপুরে দেবীর পূজাভোগ শেষ করে প্রসাদ পেয়ে তিনি প্রতিদিন পাঠশালায় যান, নিজে পড়ান ও তদন্তও করেন ভালোমতে। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে এখন একশোর বেশি দাঁড়িয়েছে। দেবীবরের প্রশংসা চারদিকে; বর্তমান রাজা পৃথ্বিনাথও তাঁকে ভালবাসেন খুব, ব্যবহার করেন বন্ধুর মতো।

পিতামহের আমলের মাটির বাড়ি দেবীবরের বাবার আমলেই পাকা

হয়েছিল। তিনখানি ঘর দুখানি পাশাপাশি একখানি অন্যধারে। দেবীবর নিঃসন্তান। মন্দিরের ভৃত্য নফর সস্ত্রীক ওখানে বাস করে; তারা ভৃত্যও বটে বাড়ির অভিভাবকও বটে। ছোটো থেকে দেবীবরকে নফর কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে, তার প্রতিপত্তি সংসারে খুবই।

শনিবার, পাঠশালা থেকে ফিরেছেন দেবীবর আজ সকাল সকাল। বাইরে রাখা গাড়ু থেকে জল ঢেলে হাত পা ধুয়ে ডাকলেন, ওগো, শুনছ। ভিতর থেকে সাড়া এল—যাই।

গৃহিণী পাথরের বাটিতে ভিজানো মিশ্রী ঢালাঢালি ক'রে স্বামীর জন্য সরবৎ তৈরি করছিলেন, দেবীবর আবার বললেন—শুনছ, চাঁপির বিয়ে, শুকো লিখেছে তোমাকে আমাকে যেতে। তোমাকে নিতে আগেই সে লোক পাঠাবে—আমি বিয়ের দিন সকালে পৌঁছব। কাল শিবু আসবে তোমাকে নিতে। মায়ের পূজার ব্যবস্থা না ক'রে তো আমার যাওয়ার জো নাই, কাজেই আমার যেতে দেরি হবে।

বিয়ের নামে উল্লসিত মগ্নময়ী বললেন—চাঁপির বিয়ে? কোন্ তারিখে, কার সঙ্গে, কোথাকার বর, কেমন বর?

—সে সব কিছুই জানি না; শুকো লিখছে, বিয়ে, এই পর্যন্ত। তার শ্বশুর ঠিক করেছেন,—তাঁর মতেই কাজ। গিয়েই দেখা যাবে, কী অবস্থা, কী ব্যবস্থা। পলাশ তো কিছুই লেখে নি। ভালো হোলে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমাকে পত্র দিত। চুপচাপ আছে দেখছি। তাউই মশায় যেরকম অর্থপিশাচ, কিসে কী ঘটাচ্ছেন, কে জানে।

দেবীবরের একটি মাত্র বোন শুকতারা, বিয়ে হয়েছে চারখানা গ্রাম দূরে। শ্বশুরের নাম শক্তীশ্বর বাঁড়ুজ্যে, তাঁর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নাই সে-ঘরে মেয়ে দেবার পূর্বে। ছেলেটি খুব ভালো দেখে তাঁর হাতে মেয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাপের উপর একটি কথা কইবার

শক্তি শুকতারার স্বামী পলাশচন্দ্রের নাই। মুখ বুজে সব সইতে হবে—বাপ যা করেন।

গৃহিণী, ছেলে, বৌ সকলকে তিনি দাবিয়ে রেখেছেন মহা শাসনে। কঠোর স্বভাব, কঠিন বাক্য, সামনে বড়ো কেউ এগোয় না।

সরবতের গেলাসটি স্বামীর হাতে ধরে দিয়ে মৃন্ময়ী রেকাবিতে ফল সাজালেন স্বামীর জন্য। ভাগ্নির বিয়ে—ননদের বাড়ি যাবেন দুদিনের জন্য, সে দুদিন স্বামীর যত্ন করবে কে ভেবে মনটা তাঁর একটু বিমর্ষ হোলো। যাই হোক, ভাগ্নি চম্পকলতার বিয়েতে কী দিতে হবে দুজনে পরামর্শ করতে লাগলেন। পুরোহিতের ঘরে কাপড়ের অভাব নাই, জোড়া জোড়া কাপড় ঘরে বস্তা বাঁধা। একখানা ফুলকাটা দামী চেলির কাপড়, একজোড়া লালপাড় শাড়ি নেবেন চম্পকের জন্য। সেকেলে নমুনার সোনার এক জোড়া কঙ্কণও নিতে হবে ঠিক হোলো। একটি ভাগ্নি,—ভালো ক'রে দিতে হবে তো। একখানা লালপাড় গরদ নেবেন শুকতারার জন্য—ননদের জন্য একখানি ভালো কাপড় না নিয়ে যাওয়া যায় না। দেবী শ্যামাকালীর কৃপায় তসর গরদ চেলি কিছুরই অভাব নাই পুরোহিতের ঘরে।

ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে রইল, কাল লোক এলেই মৃন্ময়ী রওনা হবেন। দেবীবরের মনটা চিন্তিত হয়ে রইল—পলাশ কোনো চিঠি দিল না ভেবে।

পরদিন সকালেই শিবকুমার এসে হাজির মামিমাকে নিতে। শুকতারার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। চম্পকলতার বয়স ষোলো হবে, শিবকুমার তার চেয়ে দু'বছরের বড়ো। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে শহরের হাইস্কুলে। শিবকুমারকে দেখে মামা মামি দু'জনেই খুব খুশি—কী রে শিবু, চাঁপির বিয়ে—বর কেমন হচ্ছে।

কী জানি মামা—বরের খবর তেমন কিছু শুনছি না। বাবার মেজাজ

খারাপ—মায়ের মন ভার, ঠাকুরদাদার উপর কথা বলবে কে ; জানেন তো কী রকম কড়া মেজাজের লোক। বাবা আপনাকে শীঘ্র যাবার জন্য ব'লে দিয়েছেন।

—আমার যে দেবীর পূজা শেষ না ক'রে যাবার উপায় নাই। সকালের পূজা শেষ ক'রে পূজার ভোগ দেওয়ার ভার পূজারীঠাকুরের উপর দিয়ে আমি বিয়ের দিন বেলা আটটা নাগাদ রওনা হব।

জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে মগ্নময়ী রওনা হলেন শিবকুমারের সঙ্গে। যাবার সময় নফরের বউকে ব'লে গেলেন,—দেখিস তোরা, তোর দাদা-ঠাকুরের খাওয়া-দাওয়ার যেন কোনো কষ্ট না হয়। তুই সামনে ব'সে খাওয়াস।

বিয়ে বাড়ি, সকাল থেকে আয়োজন উদ্‌যোগ চলছে।

—আয়োজন যৎসামান্য, খুব কম খরচেই কাজ সারা হবে। একটি টাকা শক্তীশ্বর বাঁড়ুজ্যের মা-বাপ। দু'শ টাকায় নাতনির বিয়ে সারবেন ফর্দ ধরে ব'সে আছেন। কথাটি কবার জো নাই বাড়ির কারো।

বেলা দশটা—দেবীবর বোনের শ্বশুর বাড়ি এসে পৌছলেন। তাউই মশাইকে বারবাড়িতে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে ভগ্নিপতির খোঁজে চললেন। দালানে উঠতেই পলাশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সম্বন্ধীর হাত ধরে পলাশচন্দ্র পাশের ঘরে ঢুকলেন।

বিপদ উপস্থিত দেবীদা—মেয়েটাকে গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলা হচ্ছে। বুড়োর বয়েস পঁয়ষট্টি। আটশো টাকা পণ নিয়ে বাবা তার হাতে চাঁপিকে বিসর্জন দিচ্ছেন। আমি তো কন্যা সম্প্রদান করব না—তা আমার কপালে যাই থাকুক। বাবা বাড়ি থেকে মেরে তাড়ান—সেও ভালো। বিয়েটা ভাঙা যায় কী ক'রে, একটা পরামর্শ দিতে পারো দাদা ? আমি মরিয়া হয়ে বাড়ি থেকে না-হয় বেরিয়ে গেলুম

—কিন্তু তোমার ভগ্নীর দশা কী হবে ভেবে দেখো। তাকে আস্ত রাখবেন না বাবা। ভাববেন, তার পরামর্শেই আমি দাঁড়িয়েছি বাপের বিরুদ্ধে, আর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও বিয়ে বন্ধ হবে না—বিয়ে তিনি দেবেনই। এক্ষেত্রে উপায় কী, আমি কাল থেকে অনাহারে আছি। এতটুকু জল রুচছে না মুখে।

পলাশচন্দ্রের সঙ্গে দেবীবরের খুব ভাব কলেজে পড়ার সময় থেকে। দুজনে একসঙ্গে বি-এ পাশ করেছেন এক কলেজ থেকে। দেবীবরের বন্ধুত্ব শুকতারাকে পলাশচন্দ্রের হাতে দেওয়ার কারণ। কে জানত তখন এমন হৃদয়হীন শ্বশুর।

দুজনে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে একটা মতলব আঁটলেন। জলস্পর্শ না করে তখনি দুজনে বেরোলেন কার্যসিদ্ধির চেষ্টায়।

দুই

সন্ধ্যার পূর্বে অধিবাসের সামগ্রী নিয়ে বর রওনা হয়েছেন নিজের গ্রাম থেকে। দুখানা গ্রাম পেরিয়েছেন। ঝাপসা হয়ে এসেছে যেন দিনশেষের ক্ষীণ আলো। রাস্তার দুধারে বড়ো বড়ো গাছ—গাছের ওপর থেকে হঠাৎ বরের পালকির উপর বড়ো বড়ো ইঁট পড়তে শুরু হোলো। বেয়ারাগুলো চমকে চারিদিকে হকচকিয়ে চাইতে লাগল কোথা থেকে ইট পড়ে মানুষ দেখা যায় না—ইঁটের পর ইঁট পড়ছে। একটা বেয়ারা চেঁচিয়ে উঠল—ভর সন্ধ্যে ভূতের কাণ্ড। চল্ বাবা পালকি ফেলে ছুটে পালাই। আর একজন বলল, পালকিখানার দাম কত জানিস। পালকি গেলে দেবে কে। পালকি বয়ে পেট চালানো ব্যবসা, পালকি গেলে খাব কী। বুড়োটাকে নামিয়ে ফেলে পালকি নিয়ে দৌড় মারি।

কথাগুলো কইতে কইতে ইঁট পড়ল আরো বিশ-পঁচিশখানা। পালকির মাথার কাঠটা গিয়েছে ফেটে। একটা বেয়ারার হাতে পড়ল একখানা ইঁট! সে চীৎকার করে পালকি ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল রাস্তায় হাতের যন্ত্রণায়। মাথায় ইঁট পড়ার ভয়ে বাকি বেয়ারাগুলো দিল পালকি রাস্তায় বসিয়ে। বুড়োর তখন হুঁস্ হয়েছে—মুখ বাড়িয়ে দেখছে, বেহারাগুলো ছিটকে পড়েছে, পালকি হোলো অচল। পালকি থেকে বেরিয়ে বর দাঁড়াল রাস্তায়, দুটো বেয়ারা ছুটে এসে অধিবাসের জিনিসগুলো লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে টাকা কড়ি যা ছিল বুড়োর সঙ্গে টেনে হিঁচড়ে নিল কেড়ে। সঙ্গে ছিল একটা চাকর। তাকে মারতে শুরু করেছিল তারা আগেই। এমন সময় গাছ থেকে নেমে পড়ল স্কুলের

ছেলের দল। বুড়োকে তাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরাল, না ফিরলে মেরে ভাঙবে হাড়—ভয় দেখাল। হতবুদ্ধি বর দু'একবার অস্ফুটস্বরে পুলিশ পুলিশ হেঁকে ছেলেদের হাতে উঁচানো লাঠি দেখে নিজের গ্রামের দিকেই দিল পাড়ি—বিয়ে রইল মাথায় তোলা। চাকরটা মার খেয়েছিল বেদম—সে সেই গ্রামে রইল পড়ে সেদিনের মতো। পালকি-বেয়ারারা প্রায় পালকির দাম উশুল করে নিয়েছিল বুড়োর পকেট থেকে।

এদিকে রাত দশটা বাজে, বিয়ে বাড়িতে বর পৌছায় না। শক্তীশ্বর ঘর-বার করছেন, "বর কৈ—বর কৈ" রব সকলের মুখে। ক্রমেই রাত বাড়ে—বর পৌছায় না, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সব বসে, পাত্র কৈ। গ্রাম নিতান্ত কাছে নয় যে তখনি লোক পাঠিয়ে খবর আনানো যায় তবু একজন লোক পাঠানো হোলো—তার খবর নিয়ে ফিরে আসতে রাত্রি হোলো শেষ। বিবাহের লগ্ন বয়ে গেছে অনেক আগে।

বুড়ো গ্রামে ফিরে রটিয়েছেন—রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি বিবাহস্থলে পৌছতে পারেন নাই। গ্রামের লোকেরা আগে থেকেই বিদ্রূপ ও বিরক্তিতে গ্রাম তোলপাড় করছিল বুড়োর বিয়ে নিয়ে। একটি বিধবা মেয়ে রয়েছে বুড়োর ঘরে ত্রিশ বছরের। এই বুড়োর বিয়ে। মেয়েটি সন্ধ্যা থেকে কান্নাকাটি জুড়েছিল খুব। বিয়ে না করে বাপকে ফিরে আসতে দেখে সে যেন ফিরে পেল নিজের প্রাণ। ষোলো আনার হরির লুট দেবে মনে মনে মানৎ করল।

শক্তীশ্বরের মেজাজ খুব খারাপ। খুঁতপড়া মেয়ে ঘরে রইল—বিয়ে করবে কে। অন্য ভাবনা—বর আবার আটশো টাকা ফিরে পাবার দাবি না করে। বদমেজাজে তাঁর স্বর উঠল সপ্তমে চড়ে। চীৎকার করে ডাকলেন, বৌমা চাঁপিকে নিয়ে এখন করা যায় কী। এমন হতভাগা মেয়েও পেটে ধরেছিলে। আমার জাত কুল মান সম্ভ্রম সব যেতে বসল ওর

জন্য। ওর মুখ আমি আর দেখব না। যেখানে হয় তোমার মেয়েকে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো। আমি একদিনও আর ওকে এখানে ঠাঁই দেব না।

চোরের মতো চুপটি করে শুকতারা নীরবে শ্বশুরের ভর্ৎসনা বাক্য-গুলি হজম করলেন। খানিক পরে বললেন, বাবা দেখি যদি দাদা ওকে নিয়ে যান। অনেকটা দূরে গিয়ে থাকলে পাড়াপড়শীদের মধ্যে আন্দোলন একটু কম হোতে পারে। আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে দাদা বৌদির সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিই। শক্তীশ্বর গজগজ করতে করতে বললেন—যাক—তাই যাক, দূর করে দাও এখান থেকে। আর কখনো এ বাড়িতে ওকে এনো না, আমি ওর মুখ দেখব না। মনে মনে ভাবলেন, টাকা আটশো তো পকেটে পুরেছি—দাবি করলে বুড়ো বেটা সে টাকা আর ফেরৎ পাবে না, বলব, বিয়ের উদ্যোগে খরচা হয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি—হাঁকিয়ে দেব এক কথায়। মেয়েটারও খোর-পোষের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল—মন্দ নয়।

সেই দিনই চম্পকলতা খুশিমনে পুরানো নহরে চলে গেল মামা মামির সঙ্গে।

তিন

ভোরে উঠে মগ্নময়ী দেখেন ঘরের কাজগুলি সব সেরে চম্পক দাঁড়িয়ে আছে মামাবাবুর খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে মামা-বাবু পরবেন। বারান্দায় একধারে মামাবাবুর মুখধোবার সরঞ্জাম গোছানো। দাঁতন, মাজন, পিতলের কলসীভরা জল, মুখের উপর একটি জলভরা ঘটি চাপানো। ধবধবে গামছাখানি ভাঁজ করে ঘটির মুখে রাখা।

মামি বললেন—কিরে চম্পক, তুই যে হার মানালি আমাকে। পাঁচটার মধ্যে সব কাজ সেরে বসলি—কাণ্ডখানা কী। এমন তালিম তোকে দিল কে।

—মা শিখিয়েছেন মামিমা—কাজ করতে হাতে ধরে। ভোরে ওঠার অভ্যাসটি তাঁরই করে দেওয়া। মা আমার নিরলস, অত্যন্ত পরিশ্রমী। ঠাকুরদার মেজাজ রেখে চলতে তিনি এমনই অভ্যস্ত যে নিজের অবকাশের কথা ভাবতে শেখেন নি কোনো দিন। কোনো কাজে খুঁত হোলে ঠাকুরদা চটে আগুন। তাঁর ভয়ে বাবাকে পর্যন্ত মা যত্ন করতে সময় পান না এতটুকু। বাবার কাজের যত ভার ছিল আমার হাতে। ব'লে চম্পকলতা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

মা-বাবা বাপের ঘর মনে পড়ে মনটা তার অধীর হয়ে উঠল, চেপে রাখল মনের ব্যথা মনে। মামা-মামির আদর যত্নে এখানে সে সুখে আছে খুবই তবু মা বাবাকে ভোলা তো যায় না।

দাদা শিবকুমার মাঝে মাঝে এসে তাকে দেখে যায়। মা-বাবার

এ মুখো হবার জো নাই। জানলে ঠাকুরদা রক্ষা রাখবেন না। মা পত্র দেন শিবকুমারের হাতে; মেয়ে বেঁচে আছে, সুখে আছে, এতেই তাঁরা সুখী।

দেবীবর ভাগ্নি চম্পকলতার সুন্দর সদভ্যাস ও নিরলস প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হন। ভাবেন, আর একটু মানুষ করে তোলা যায় কী করে। স্ত্রীকে বললেন, মগ্ন, আমি ঠিক করেছি তোমাকে ও চম্পককে রাতে পড়াব—বাংলা সংস্কৃত ইংরেজি যা তোমরা পড়তে চাও, যতদূর শিখতে পারো। ঘরের কাজ এখন ভাগাভাগি হয়ে অবসর পেয়েছ ঢের হেলায় সময় নষ্ট করা চলবে না। চরকায় সুতো কেটে পৈতে তৈরি করে তো রাশ করেছ, তাও করো, পড়াও শেখো। পৃথিবীর খবর জানবে তাতে অনেক বেশি।

মামি-ভাগ্নিতে উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠল খুব। মগ্ন বললেন, আমি বুড়ো হোতে চললুম, আমার আবার পড়া, চম্পককে পড়াও।

—সে হবে না, তোমাকে নিশ্চয় পড়তে হবে। বসে বসে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংস করা চলে না, পৃথিবীর নুন খেয়ে গুণ গাইতে হবে।

—আমি তো মা শ্যামাকালীর অন্ন খাই, পৃথিবীর অন্ন খাব কেন।

—পৃথিবী ও মা শ্যামাকালী যে এক—তাতো জানো না। লেখাপড়া শেখো তবে তো জানবে।

—সে আবার কী রকম।

—পরে বুঝবে।

—মন্ত্র সাধন করে এই বুঝি শিখেছ।

—মন্ত্রের সঙ্গে পৃথিবীর কাজের সঙ্গে যোগ ঘটালে তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কালই আমি তোমাদের জন্যে বই নিয়ে আসব।

চম্পক মহা উৎসাহে লেগে গেল লেখাপড়া শিখতে। মামিমাও

মুখ বুজে মেনে নিলেন স্বামীর আজ্ঞা। মনে মনে ভাবলেন, দিনকতক না পারলেই ছেড়ে দেবেন নিজে, বুড়ো বয়সে আবার পড়া।

লিখতে শিখে চম্পক মাকে চিঠি লিখে জানাল, মামাবাবুর কাছে সে লেখাপড়া শিখছে। মায়ের মন চম্পকের ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক সময় চিন্তায় অবসন্ন হয়। বিয়ে তো মেয়েটার হয় নি। পুনরায় বিবাহ হওয়া সম্ভব হবে না কি—শ্বশুর থাকতে তো নয়। মনের কথা মনেই চেপে রাখেন। দাদা তাকে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন, এতে শুকতারার মনটা অনেকখানি হালকা হোলো। বুক থেকে চিন্তার বোঝা যেন একটু কম্‌ল। চম্পককে পাঠিয়ে পর্যন্ত শ্বশুরের ভয়ে তিনি কোনো দিন মুখে আনেন নি যে আমি বাপের বাড়ি যাব। শ্বশুর নাম করেন না চম্পকের একদিনও।

তিন বছর কেটে গেল, চম্পক মামামামির কাছে প্রতিপালিত হচ্ছে।

চার

৩

কালীপূজার রাত। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে শ্যামাকালী দেবীর মন্দিরে পূজার ঘটা লাগে খুব। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের পোড়ো জমি জুড়ে মেলা বসে জমকিয়ে। নানা গ্রামের লোক জড়ো হয় প্রায় হাজার খানেক। রাতের মেলা চোখে দেখা যায় না সব স্থানটা ভালো করে। পঞ্চাশটা মশালের আলো জ্বলে তাতেও আলো হয় না যথেষ্ট। মেয়েদের চলাফেরার পক্ষে স্থানটা সুবিধার নয়। গুণ্ডা জড়ো হয় অনেক। দেবী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের মনে এতই প্রবল যে ভয় ঠেলে তারা দেবীর পা দুখানি স্পর্শ করা, পূজার ফুল মাথায় নেওয়া, চরণামৃত মুখে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে প্রতি বৎসর ঐ দিনে।

দেবীবর স্ত্রীকে ও চম্পককে দেবী দর্শন করিয়ে আনেন সাবধানে সন্ধ্যায়, বেশি রাতে যেতে দেন না কখনো। গহনাচুরি, টাকাচুরি তো হয়েই থাকে—এমন কি মানুষ চুরিও হয়েছে শোনা যায় মাঝে মাঝে।

এ বছর পূজার দিন গভীর রাত্রে পূজা শেষ করে পুরোহিত দেবীবর মন্দিরের দ্বার পেরিয়েছেন, নারীকণ্ঠে ফিস ফিস কথাবার্তা শুনলেন। একজন বলছে :—

১ম—মেয়েটা গেল কোথায়। বিপদ বাধাল দেখছি, বোকা মেয়ে বাড়িতে না-ব'লে দলের সঙ্গে চলে এল, এখন ফিরে গিয়ে বলা যাবে কী।

২য়—হাভাতে মেয়ে দল ছেড়ে সরে গেল কেন। আমাদের হাতে দড়ি দেবে শেষটা।

৩য়—অন্ধকারে কে যেন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তুষমন চেহারার একটা গুণ্ডা মনে হোলো।

২য়—সর্বনাশ এখন উপায়।

১ম—ফিরে গিয়ে বলা যাবে আমরা কিছু জানি না; যায় নি সে আমাদের সঙ্গে।

২য়—তাই কি হয়। পাড়ার লোক দেখেছে যে রোগা মেয়েটা ছেলে কোলে নিয়ে আমাদের সঙ্গ ধরে পথে চলছে।

১ম—মর্ গে তবে খবর দিয়ে। থানায় হাজির হয়ে সাক্ষী দে, তোর সাহস বেশি।

২য়—সাহস নয় দিদি, মিথ্যা বললে আরো প্যাঁচে পড়তে হবে। তার চেয়ে তার স্বামীকে গিয়ে সত্য খবরটা দেওয়াই ভালো।

কথা শোনা গেল না আর, কে জানে কোনদিকে তারা সরে পড়ল অন্ধকারে।

পুরোহিত উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন ব্যাপার কী। ধীরে ধীরে মন্দিরের সিঁড়ি কয়েক ধাপ নেমেছেন, দেখলেন, মন্দিরের শেষ ধাপে শোয়ানো একটি শিশু ঘুমিয়ে আছে। অনুমানে বুঝলেন, সেই হারানো মেয়েটির শিশু হবে। কার্তিক মাসের হিম, শিশুটিকে এইখানে ফেলে রেখে গেলে হিম খেয়ে সে মারা পড়তে পারে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেবীবর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। শেষে মন্দিরের পুরানো ভৃত্য নফরকে বললেন :—

—শিশুটিকে তুলে নিয়ে চল্ আমার সঙ্গে। পুরোহিত এগিয়ে চললেন —শিশুকোলে নফর পিছু পিছু। ডুয়ার বন্ধ করে দিয়ে মামি-ভাগ্নি শুয়ে ঘরে, নফরের বৌ আছে আগলে তাদের। কড়া নাড়তেই চম্পক

বেরিয়ে এসে মামাকে দুয়ার দিল খুলে। মামার পিছনে শিশুকোলে নফরকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। মামা বললেন,—শিশুটিকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যা চম্পক।

মামার আজ্ঞায় চম্পক তাড়াতাড়ি নফরের কোল থেকে শিশুকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে মামিমার ঘরে গিয়ে বলল—মামিমা, দেখুন, দেখুন, কী সুন্দর শিশু এনেছেন মামাবাবু। মগ্নময়ী ঘুমের ঘোরে বিস্ময়ে চোখ বড়ো করে বললেন ঃ—

—শিশু! মামাবাবু এনেছেন! কোথা থেকে।

—কী জানি মামিমা।

—নিজে এসেছেন তো।

—হাঁ, সঙ্গে নফর আর এই শিশু।

—অবাককাণ্ড। কার শিশু কুড়িয়ে আনলেন।

—শিশুটি বড্ড সুন্দর—দেখুন না চেয়ে।

—কোথা থেকে আনলেন না জেনে এখন ছোঁয়াছুঁয়ি করাসনে সব। দেবীবর ঘরে ঢুকে বললেন, খুব ভালো জাতের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে—নিশ্চিন্ত মনে ঘরে স্থান দাও—দেবীর প্রসাদ ব'লে জেনে রাখো।

চম্পক শিশুটিকে কোলে নিয়ে বারংবার তার মুখে চুমো খেতে লাগল। শিশুটি নাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল। ক্ষিপ্রহাতে চম্পক তাকে নিজের ঘরের তক্তায় শুইয়ে ঘরে-রাখা দুধ খানিকটা পাতার জ্বালে গরম করে খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়াল।

ভোরে উঠে চম্পক দেখল শিশু তার গায়ের উপর পড়ে তাকে মা-মা ব'লে ডাকছে। কচি শিশু চিনতে পারেনি সে নিজের মা কি না।

পাঁচ

মন্দিরের পুবধারে প্রকাণ্ড একটা পুকুর, দুদিকে বাঁধাঘাট। পূর্ব-রাজাদের আমলের পুকুরটা দেবতার কাজে এখন ব্যবহার হচ্ছে। এখন সেটি দেবত্র সম্পত্তির অন্তর্গত। পুরোহিত পূজায় যাচ্ছেন, পথে হৈচৈ শুনে এগিয়ে গেলেন পুকুরের দিকে। দেখলেন একটি ক্ষীণাঙ্গী কিশোরীর মৃতদেহ জলে ভাসছে। কী করে জলে ডুবল, কখন মারা গেল কেউ তার খবর বলতে পারছে না। চিন্তিত মনে তিনি মন্দিরের দিকে ফিরলেন, মনে মনে ভাবলেন হয়তো বা মেয়েটি ঐ খোকার মা। কথাটা তাঁর মনে চাপা রইল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জানল না।

তিন বৎসর কেটে গেছে। শিশুটি চম্পকের ভরা স্নেহের কোলে দিনে দিনে বেড়ে উঠে তিন বছরেরটি হয়েছে। দেবীর দান ভেবে চম্পক তার নাম রেখেছে প্রসাদ। দেবীবর ব'লে দিয়েছেন,—চম্পক, এ খোকা তোর। তোর যা খুশি নাম দে, যেমন করে চাস্ মানুষ কর্। মনে মনে ভাবতেন, কী জানি খুঁৎপড়া মেয়ে চম্পার যদি আর বিয়ে নাই হয় তবু ছেলেটাকে নিয়ে জীবন কাটাতে পারে।

প্রসাদ চম্পককেই মা ব'লে জানে, মা ব'লে ডাকে। মা-সম্বন্ধে তার অন্য কোনো ধারণাই জন্মে নাই।

শিবরাত্রিতে শ্যামাকালীর মন্দিরে দেবীর পূজা হয় ধুম করে। বহু লোক শ্যামাকালীর মন্দিরে এসে রাত জাগে। দেবীদর্শন জাগরণ সব তাদের একসাথে হয়। ভোরের সময় উপবাসের পারণ। সকলেই জল যোগ করবে সে সময়। মন্দিরের দ্বার খুলে পুরোহিত দেখেন, দেবীর

গলায় বড়ো বড়ো মুক্তার নহর গাঁথা, বড়ো বড়ো পান্নার খামি দিয়ে থাকে থাকে সাজানো সরস্বতীহার পরানো।

দেবীর গলায় ফুলহার চিরদিনের দেখা। সেই গলায় আজ রত্নহার কে পরাল। বিস্ময়! বিস্ময়! মহাবিস্ময়।

পুরোহিত স্তম্ভিত, একলা এগুতে পারছেন না। অলৌকিক দৈব ঘটনা না মানুষের কাজ। হতবুদ্ধি হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। পূজা-ক্ষণের কথা মনে রইল না। হঠাৎ ঢ্যাঁড়রা পেটার শব্দ, রাজবাড়ির বরকন্দাজরা ঢ্যাঁড়রা পিঠে ফিরছে। রানীমায়ের গলার মুক্তাহার গত রাত্রে চুরি গেছে। বহুমূল্য হার। পাওয়া চাই-ই-চাই। নতুবা রাজা বাহাদুর মাথা রাখবেন না কারো।

দাসদাসী, পাইক বরকন্দাজ সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত। পুরোহিত দেবীবর হেঁকে বললেন,—দেখো দেখো, মায়ের মুক্তাহার—এটিই রানীমায়ের হারানো হার কি না। উপস্থিত সকল লোক বিস্মিত, চমৎকৃত। পাইক ছুটল রাজবাড়ি খবর দিতে।

খবর শুনে স্থির হোলো, রানীমা নিজে আসবেন নিজের গলার হার চিনতে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রানীমায়ের পালকি এসে হাজির। সঙ্গে এসেছেন রাজ-দেওয়ান, ব্যাপারের তদন্ত করতে।

দেওয়ান বললেন চোরের কাজ। রানীমা বললেন, মায়ের গলায় হার কী মানিয়েছে, এ হার আমি খুলে নিতে পারব না।

দেওয়ান বললেন, অনেক দামী হার মা—দেবীর গলায় থাকলে চুরি যাবার সম্ভাবনা থাকবে প্রতিক্ষণে। পুরোহিত বললেন, নিন, খুলে নিন রানীমা। দেবমন্দিরের গহনা চুরির খবর সবাই জানে। এতে চোরের উপদ্রব পড়বে আমাদেরও উপর, তাতে প্রাণের ভয় আছে।

—যাই বলুন আপনারা, হার আমি খুলে নিতে পারব না। রানী মায়ের উত্তর।

দেওয়ানজি এক বুদ্ধি ঠাওরালেন। বললেন—হারের দাম কত রানীমা।

—দাম জানে কে। এ তো আজকার জিনিস নয়। বহু পুরুষ আগের কেনা—রাজবাড়ি তখন এই পুরানো নহরেই ছিল। আজ আবার সেই পুরানো হার পুরানো নহরেই ফিরে এসেছে। দেওয়ানজি, —এ কি ফিরিয়ে নেওয়া যায়।

এদিকে চোরের ভয়ে পুরোহিত হার রাখতে অত্যন্ত নারাজ—মহাসমস্যা। ভেবে চিন্তে দেওয়ানজি বললেন, রাজবাড়িতে যে দেবীমূর্তি আছেন, তাঁরই গলায় এ হার পরানো থাক্—সেখানে পাহারা অনেক, চোরের ভয় নাই। এ পোড়ো মাঠে মুক্তা হার কেন। দেবী আছেন সর্বত্র।

কথাটা রানীমায়ের মনে লাগল, বললেন,

—মূল্য দিতে হবে দেওয়ানজি, এখানে তাহলে মূল্য দিতে হবে।

—মূল্য কত হবে মা।

—আপনিই অনুমান করুন।

—ত্রিশহাজার।

—তাতো হবেই ; এই টাকা আপনি পুরোহিত ঠাকুরের হাতে দিন ; তিনি দেবীর অভিপ্রায় বুঝে এই টাকা ব্যবহার করবেন।

পুরোহিত দেবীবর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠলেন—দেবী শ্যামাকালীর অর্থ আর কে নেবে শ্যামাকালী পাঠশালা ছাড়া। এই অর্থে পাঠশালার প্রভূত উন্নতি সাধন করা যাবে। তাতে বহুজনের কল্যাণ। জীবের কল্যাণই তো মায়ের আশীর্বাদ।

ছয়

শ্যামাকালী পাঠশালা আজ উচ্চইংরেজি শিক্ষালয়ে পরিণত হয়েছে। নূতন শিক্ষক এসেছেন কয়েকজন। অশোকনাথ মুখুজ্যে এম-এ বি-টি, তিনি হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন। শিক্ষালয়ের নামটি আছে পূর্বের মতো "শ্যামাকালী পাঠশালা।" রানীমা নাম বদল করতে নারাজ। দেবীর নামেই শিক্ষালয়টি উৎসর্গীকৃত।

প্রথম যেদিন অশোকনাথ এসে বিদ্যালয়ে পৌছলেন, তাঁর মুখ দেখে পুরোহিত দেবীবর চমকে গেলেন। অবিকল শিশু প্রসাদের মুখ যেন বসানো। পুরোহিত এই বিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ। তাঁরই উপর তত্ত্বাবধানের সব ভার।

প্রসাদের সঙ্গে অশোকনাথের মুখশ্রীর সাদৃশ্যের কথাটা তিনি মনে চেপে রেখে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হোতে লাগলেন বেশি করে। জানলেন তাঁর স্ত্রী নাই। বিপত্নীক কি কুমার সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না সহজে।

দিন কাটে—ছয়মাস চলে গেল। স্ত্রীকে একদিন গোপনে পুরোহিত বললেন,—একটা বড়ো গোপনীয় কথা, কানে না যায় কারো, মনে ঘুরছে, কাউকে বলতে সাহস হয় না। শ্যামাকালী পাঠশালার হেডমাস্টার অশোকনাথ মুখুজ্যের মুখের সাদৃশ্য এতই প্রসাদের মতো যে তিনি ওর আত্মীয় না হয়ে যান না, বাপ হোতেও পারেন। চম্পক শুনলে ভয়ে সারা হবে—ভাববে, তার খোকাকে কেউ তার আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়ে কেড়ে নিয়ে না যায়। বেচারী চম্পক তাকে ছাড়তে পারবে না কখনো। এমনি সে মায়ায় জড়িয়েছে ওকে মানুষ ক'রে।

যাই হোক, আমি অশোককে একবার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি বাড়িতে। তুমি প্রথম দেখো। তোমাতে আমাতে দৃষ্টির মিল হয় কি না দেখি।

পরদিন বৈকালে অশোকনাথকে নিয়ে বাড়ি এলেন দেবীবর। আড়াল থেকে দেখে মগ্নময়ী দৃঢ়রূপে ধরে নিলেন, নিশ্চয়ই এ প্রসাদের বাপ হবে, অবিকল এক মুখ।

জলযোগ করে অশোকনাথ হলেন বিদায় সন্ধ্যার সময়। রাত্রে স্বামীকে মগ্নময়ী বললেন, নিশ্চয় প্রসাদের বাপ হবে, ভালো ক'রে খবর নাও। বিপত্নীক হোলে দাও না চম্পকের সঙ্গে বিয়ে—সব দিকে তাহলে মঙ্গল ঘটে। কথাটা দেবীবরের বড্ড মনে লেগে গেল। তিনি উঠে পড়ে এ কাজে উদ্যোগী হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় দুজনে বেড়াতে বেরিয়ে দেবীবর অশোকনাথকে বললেন, আপনি আমাকে বিশ্বাসী বন্ধু মনে করতে পারেন।

—নিশ্চয়।

—একটি রহস্যময় ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে তোলাপড়া হয়ে আমাদিগকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আপনাকে সেটা বলতে চাই।

অশোকনাথের বুকটা কেমন নাড়া পেয়ে উঠল। বুকের ভিতরের একটা চাপা বেদনা আজ পুরোহিতের সামনে হঠাৎ ভেঙে বেরিয়ে না পড়ে।

—বলুন, আমি প্রস্তুত আছি শুনতে।

—ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার প্রশ্ন, আপনি কুমার না বিবাহিত না বিপত্নীক।

—এ কথাটা আমার পক্ষে বড়ো কষ্টদায়ক। আপনার এতে কিছু প্রয়োজন আছে কি। আপনাকে অবিশ্বাস করছি না, প্রশ্ন করছি মাত্র।

—জানি, এরূপ প্রশ্ন ভদ্রতাসংগত নয়, তবু বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করেছি—কারণ আছে।

—কারণটা কী আগে যদি বলেন, তবে শেষে আমার যদি কিছু বলার থাকে—বলব।

দেবীবর একটি শিশুকে তিন বৎসরপূর্বে কালী পূজার রাত্রে কুড়িয়ে পাওয়ার ঘটনা থেকে আজ পর্যন্ত সেই শিশু তাঁর বাড়িতে পালিত হচ্ছে—অশোকনাথকে বললেন।—তার এত সাদৃশ্য আপনার চেহারার সঙ্গে যে খুব সম্ভব আপনার কোনো আত্মীয় হবে। ছেলেটিকে আমি একবার আপনাকে দেখাতে চাই।

অশোকনাথের বুকের ভিতরটা যেন মুঠো করে চেপে ধরল কেউ। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, দেখাবেন দেবীবাবু।

ঠিক হোলো—পরদিন সন্ধ্যায় অশোকনাথ বাড়ি আসবেন পুরোহিতের।

সাত

চম্পক শুনেছে প্রসাদের বাবা আসছেন আজ। সে ধরে নিয়েছে, যিনি আসছেন, তিনিই প্রসাদের বাবা। ভয়ে তার বুকের ভিতর কাঁপছে। তার খোকাকে এবার কে যেন কেড়ে নেবে। সারাদিন সে জলস্পর্শ করে নাই, কেঁদে কেঁদে দিন কাটিয়েছে, মামা-মামি সান্ত্বনা দিচ্ছেন—সে প্রবোধ মানে না। অনেক বুঝিয়ে ধমক দিয়ে মামা তাকে বৈকালে একটু ডাবের জল খাওয়ালেন। খোকাকে সে আজ কিছুতেই ছাড়বে না, তার বাপের কাছে যেতে দেবে না—মনে মনে পণ করে বসে আছে।

সন্ধ্যায় অশোকনাথ উপস্থিত হলেন। চম্পক ভেবে আছে, না জানি আগন্তুক লোকটা কী রকম দুষ্ট চেহারার হবে, নতুবা সে কি খোকাকে কেড়ে নিতে আসে। ভয়ে ভয়ে সে দুয়ারের ফাঁক দিয়ে চোখ ফেলল অশোকনাথের মুখের দিকে। ওমা—কী সুন্দর মুখ, অবিকল যে খোকার মতো। দুষ্টতা মাখানো নাই সে মুখে একটুও। ব্যথা সরিয়ে তার অন্তর যেন লুটিয়ে পড়ল অশোকনাথের পায়ে। "খোকাকে কেড়ে নিয়ো না গো—" যেন গুমরে গুমরে বলল।

দেবীবর চম্পকের ঘরে গিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অশোকের সামনে, ধরলেন তার মুখটি তুলে। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার ভাগ্নি চম্পকলতা এ'কে লালন করেছেন পুত্রস্নেহে। খোকাকে ছাড়তে পারা তার পক্ষে অসম্ভব। আপনি এখন বলুন, ছেলেটি আপনার কে।

—মর্মান্তিক ঘটনা। আমার ছেলে ছিল তাকে ফিরে পাবার আশা ছিল না। গত কথা অভিশাপের মতো আমার জীবনে জড়িয়ে আছে।

খোকা আমার দেবী শ্যামাকালীর মন্দিরেই তার জন্ম ঋণ পরিশোধ করেছে। আপনার ভাগিনেয়ী, যিনি তাকে মানুষ করেছেন, খোকা এখন তাঁর। আমার দাবিদাওয়া কিছু নাই।

পুরোহিত তখন অশোকনাথের কাছে চম্পকের বিবাহ-বিভ্রাটের আমূল বৃত্তান্ত, খুঁৎপড়া কুমারী-জীবন নিয়ে তার মামার বাড়িতে বাসের খবর সবিস্তারে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করলেন, আমার ও আমার স্ত্রীর বড়ো সাধ চম্পকলতাকে আপনি গ্রহণ করেন।

—অপরিশোধনীয় ঋণ আমার তাঁর কাছে। তাঁর ইচ্ছা কী আগে জানুন।

পুরোহিত ডাক দিলেন—মা চম্পক শোনো, খোকাকে চির জীবনের মতো যাতে তোমাকে ছাড়তে না হয় তার ব্যবস্থা করছি। তুমি স্বীকার আছ তো।

চম্পকের সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূর্তি ও স্নেহে উদ্ভাসিত মনটি মুখে ফুটে রয়েছে দেখে অশোকনাথ বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন পলকশূন্য হয়ে।

আট

বিনা আয়োজনে, বিনা উদ্যোগে নিজে পৌরোহিত্য করে সেই রাতেই অশোকনাথের হাতে দেবীবর চম্পককে সম্প্রদান করলেন।

বিনা যত্নে শয্যাপাতা ঘরে চম্পকের হোলো বাসর। সেকেলে কাঁচ ঘেরা লণ্ঠনে তেলের ঘোলাটে আলো জলছে মিটির মিটির,—তার বাসর ঘরের দীপসজ্জা। খোকা ঘুমিয়ে আছে আগে থেকে বিছানায়। কর্ম-নিপুণা চম্পকলতার তখনো কাজে মন।

অশোকনাথ বিছানায় গেলেন, চম্পক গেল পাশের ঘরে কাজ সারতে। কাপড় চোপড় গুছিয়ে রেখে, ভোরের সময় যা কিছু দরকার হবে তার ব্যবস্থা করে এসে বসল সে বিছানাপাতা তক্তার একটি কোণে।

অশোকনাথ তখনো মশারির মধ্যে বসে আছেন, শোন্ নাই। বললেন, চম্পক, শোবে না?

—খোকাকে কোলে নেবেন না?

—তুমি কোলে দাও।

চম্পক মশারির ভিতর ঢুকে ঘুমন্ত খোকাকে তুলে নিয়ে তার দুই গালে দুটি চুমো দিয়ে অশোকনাথের কোলে শুইয়ে দিল।

বিমুগ্ধ অশোকনাথ চম্পকের হৃদয়ের অতলস্পর্শ গভীরতা অনুভব করে, তার হাতটি ধরে বললেন—অতুলনীয় দান।

কথাটা চম্পকের কানে গেল না। ঝাপসা আলোয় সে একদৃষ্টে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে আছে। ধীরে ধীরে অস্ফুট কণ্ঠে বলল—দুটি মুখ অবিকল এক রকম, কী সুন্দর। উদ্বেলিত হৃদয়ে অশোক

চম্পকের দুটি হাত নিজের দুই হাতে ধরে বললেন—প্রেম কী সুন্দর, তুমি কী সুন্দর।

* * * *

পুরোহিত রাত্রেই কুশণ্ডিকা সেরেছিলেন—সকালে পূজার ক্ষণে তাঁর সময় হবে না বলে।

চম্পকের স্বামীর গৃহে যাত্রার সময় হয়ে এল। যাবার আগে দেবী শ্যামাকালীকে সে প্রণাম করে যাবে।

মন্দিরে প্রবেশ করে দেবী-মূর্তির পদতলে আগে খোকাকে দিল শুইয়ে—শেষে মায়ের চরণে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বলল, মা শ্যামাকালী—কী ধন দিয়েছিলি মা।

দেবীপদতল ছেড়ে ইত্যবসরে প্রসাদ কখন যে মায়ের কোলে উঠে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে, সেদিকে চম্পকের হুঁস নাই।